বাংলা ভাষাচর্চা

বাংলা ব্যাকরণ। ষষ্ঠ শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

পর্ষদ-এর কথা

ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বাংলা ব্যাকরণের বই 'বাংলা ভাষাচর্চা' প্রকাশ করা হলো। এই 'বাংলা ভাষাচর্চা' বইটি ব্যাকরণ এবং নির্মিতি অংশ নিয়ে গঠিত। ব্যাকরণ অংশ যেমন ছাত্রছাত্রীদের ভাষাজ্ঞানকে নির্ভুল ও যথাযথ করবে, তেমনি নির্মিতি অংশ সাহায্য করবে তাদের সৃজনশীল লেখালিখির ক্ষেত্রে।

ছাত্রছাত্রীদের প্রেরণা জোগাতে এবং ব্যাকরণের মতো তথাকথিত নীরস বিষয়কে সহজ ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দের নিরলস প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

'বাংলা ভাষাচর্চা' বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

মার্চ, ২০১৭
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০১৬

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি ‘বিশেষজ্ঞ কমিটি’ গঠন করেন। এই ‘বিশেষজ্ঞ কমিটি’-র ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয়স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক - এর পর্যালোচনা,পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক রচিত হলো। আমরা এই প্রক্রিয়া শুরু করার সময় থেকেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ (NCF 2005) এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE 2009) এই নথি দুটিকে অনুসরণ করেছি।

ষষ্ঠ শ্রেণির ‘বাংলা ভাষাচর্চা’ পুস্তকটি ব্যাকরণ এবং নির্মিতি অংশ নিয়ে গঠিত। চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণির ‘বাংলা ভাষাপাঠ’ বইগুলির সম্প্রসারণ উচ্চ-প্রাথমিকের এই বই। বাংলা পাঠ্যপুস্তকের সম্পূরক এই পুস্তকে ব্যাকরণের ধারণা এবং বিবিধ প্রয়োগকে শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও পদ্ধতির উপর নির্ভর করে আমরা ব্যাকরণচর্চার অভিমুখের পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করেছি। ষষ্ঠ শ্রেণির ‘বাংলা ভাষাচর্চা’ বইটির ব্যাকরণ অংশ লিখেছেন অধ্যাপক রাজীব চৌধুরী। এই সহায়তার জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষার সারস্বত নিয়ামক মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তাঁদের নির্দিষ্ট কমিটি বইটি অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন,পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান

‘বিশেষজ্ঞ কমিটি’

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মার্চ, ২০১৭

নিবেদিতা ভবন, পঞ্চম তল

বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)   রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী
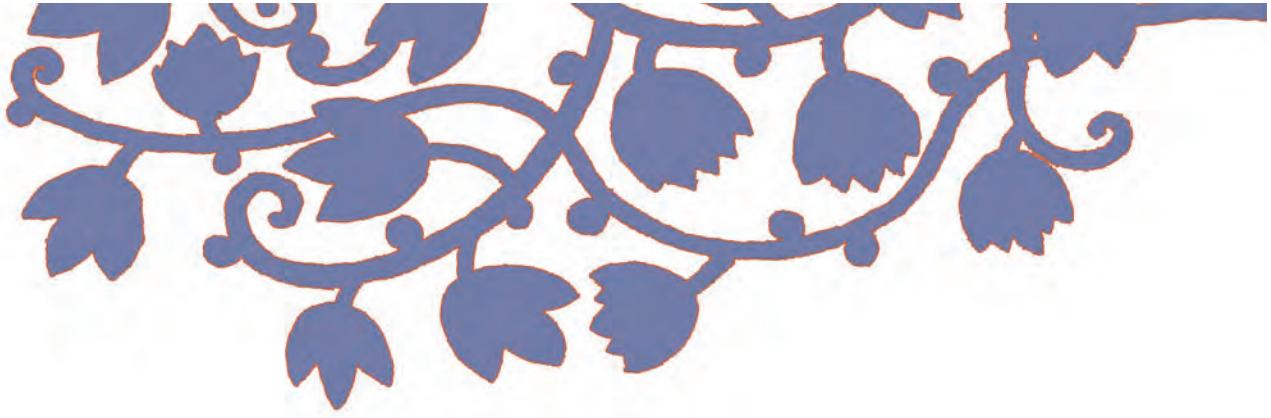
ঋত্বিক মল্লিক   সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়   রুদ্রশেখর সাহা   মিথুন নারায়ণ বসু

ইলোরা ঘোষ মির্জা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

অলয় ঘোষাল

পুস্তক নির্মাণ

বিপ্লব মণ্ডল

সূচিপত্র

ব্যাকরণ অংশ

নির্মিতি অংশ

প্রথম অধ্যায়

বিসর্গসন্ধি

পাশাপাশি বসতে পারে এমন দুটি শব্দ কখনো কখনো পরস্পরের সঙ্গে সন্ধি করে এটা তোমরা শিখে গেছ। অনেকটা দুটো ছোটো বরফের টুকরো জোড়া লেগে একটা বড়ো বরফের টুকরো হবার মতো — তাই তো ? সেভাবেই দুটো শব্দের মধ্যে প্রথম শব্দটার শেষ ধ্বনি আর পরের শব্দটার প্রথম ধ্বনি আসলে পরস্পরের মধ্যে সন্ধিটা করে। তাদের মধ্যে অনেকরকমভাবে সন্ধি হয়, এটাও তোমরা দেখেছ। ধরো, **দুটো ধ্বনিই**

জুড়বার পরে বদলে গিয়ে একটা নতুন ধ্বনি হয়ে যায়। যেমন :

যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট

(য্ + অ + থ্ + আ) + (ই + ষ্ + ট্ + অ)
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

= য্ + অ + থ্ + এ + ষ্ + ট্ + অ
১ ২ ৩ (★)৬ ৭ ৮

আ + ই = এ

তাহলে বাঁদিকের প্রথম শব্দের শেষ ধ্বনি 'আ' আর দ্বিতীয় শব্দের শুরুর ধ্বনি 'ই' মিলে ডানদিকে দুটোকে মিশিয়ে, সন্ধি করে একসঙ্গে বদলে দিচ্ছে 'এ' ধ্বনিতে। ১, ২, ৩ আর ৬, ৭, ৮ ধ্বনিগুলো একই থাকল; কেবল ৪ + ৫ = (★) এইভাবে বদলে গেল। স্বরধ্বনি আর স্বরধ্বনিতে সন্ধিতে নতুন স্বরধ্বনি তৈরি হলো, তাই এটা

স্বরসন্ধি, এটা তোমরা জানতে। আবার **দ্বিতীয় নিয়মে দুটো ধ্বনি জুড়বার পর তারই মধ্যে একটা ধ্বনি, সন্ধির ফলে তৈরি ধ্বনি হচ্ছে।** যেমন :

পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষাই + ঈ = ঈ

মহা + আশয় = মহাশয়   আ + আ = আ

তৃতীয় নিয়মে বাঁদিকের দুটো ধ্বনি জোড়ার পর ডানদিকে সেটা দুটো নতুন ধ্বনি হচ্ছিল (যুক্তব্যঞ্জন)। যেমন :

উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস ত্ + শ্ = চ্ছ (চ্ + ছ্)

উৎ + হত = উদ্ধত   ত্ + হ্ = দ্ধ (দ্ + ধ)

চতুর্থ নিয়মে বাঁদিকের দুটো ধ্বনি জোড়ার পর ডানদিকে সন্ধিযুক্ত শব্দে প্রথম শব্দের শেষ ধ্বনিটা কেবল বদলাচ্ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় শব্দের প্রথম ধ্বনিটা একই থাকছিল। যেমন :

বিপদ + জনক = বিপজ্জনক

দ্ + জ্ = জ্জ (জ্ + জ্)

চলৎ + চিত্র = চলচ্চিত্র ত্ + চ্ = চ্চ (চ্ + চ্)

সৎ + ইচ্ছা = সদিচ্ছা ত্ + ই = দি (দ্ + ই)

বাক্ + আড়ম্বর = বাগাড়ম্বর

ক্ + আ = গা (গ্ + আ)

পঞ্চম নিয়মে বাঁদিকের দুটো ধ্বনি জোড়ার পর ডানদিকেও সে দুটোই থাকে এবং তার সঙ্গে একটা অতিরিক্ত ধ্বনি যুক্ত হয়ে যাচ্ছিল।

যেমন :

কথা + ছলে = কথাচ্ছলে

আ + ছ্ = আচ্ছ (আ + চ্ + ছ্)

পরি + ছেদ = পরিচ্ছেদ

ই + ছ্ = ইচ্ছ (ই + চ্ + ছ্)

অনু + ছেদ = অনুচ্ছেদ

উ + ছ্ = উচ্ছ (উ + চ্ + ছ্)

পরের নিয়মগুলিতে ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জন অথবা স্বরের সঙ্গে ব্যঞ্জনের সন্ধি হচ্ছে। এগুলির নাম **ব্যঞ্জনসন্ধি**, এটাও তোমরা শিখে গেছ। বাকি রয়েছে যেটা, এবার সেই সন্ধিটা শেখার পালা। এটার নাম হলো **বিসর্গসন্ধি**।

শুরুটার কখনো অন্য একটা শুরু থাকে। বিসর্গসন্ধি শুরুর আগে তাহলে সেই বিসর্গটাকে নিয়ে শুরু করা যাক। একটু ভেবে বলো দেখি বিসর্গ (ঃ) জিনিসটা শব্দের মধ্যে কোথায় কোথায় বসে — শুরুতে, মাঝখানে, শেষে সবজায়গাতেই কি ?

কী খুঁজে পেলে ? মাঝে বসছে কিংবা শেষে বসছে, কিন্তু শুরুতে নয় — তাই তো ? এটা

নিশ্চয়ই তোমরা খেয়াল করেছ যে, বাংলায় বিসর্গ (ঃ)-র মতোই অনুস্বর (ং), অন্তঃস্থ-অ (য়), খণ্ড-ত (ৎ) — এরকম কয়েকটা অক্ষর কোনো শব্দেরই গোড়ায় বসতে পারে না।

পুনঃ, অন্তঃ, প্রাতঃ, অহঃ, — এগুলির ক্ষেত্রে শেষে বিসর্গ বসছে।

দুঃখ, দুঃসহ, দুঃসময়, দুঃসাধ্য, স্বতঃস্ফূর্ত, নিঃস্পন্দ — এগুলির ক্ষেত্রে মাঝে বিসর্গ বসছে।

প্রথম শব্দের শেষ ধ্বনি আর দ্বিতীয় শব্দের শুরুর ধ্বনি যুক্ত হলে যেভাবে স্বরসন্ধি কিংবা ব্যঞ্জনসন্ধি হতো — বিসর্গসন্ধির ক্ষেত্রে প্রথমেই বুঝতে পারছ যে, ব্যাপারটা একটু আলাদা হচ্ছে। তার মানে, এবার প্রথম শব্দের শেষে বিসর্গ থাকলেও,পরের শব্দের শুরুতে কখনোই বিসর্গ থাকতে পারে না। তাহলে বিসর্গসন্ধির একটা মূল নিয়ম শেখা হয়ে গেল।

প্রথম শব্দের শেষে অবস্থিত বিসর্গের সঙ্গে পরের শব্দটির শুরুতে থাকা স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি যুক্ত হলে সন্ধির ফলে তা নতুন শব্দে অন্য ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। একেই আমরা বিসর্গসন্ধি বলে থাকি।
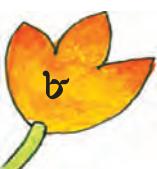
শব্দের শেষে বিসর্গচিহ্ন দিয়ে সেই বানান অনুযায়ী বাংলা লেখার চল এখন ক্রমশই কমে যাচ্ছে। তাই অন্ততঃ, তৃতীয়তঃ, ক্রমশঃ এই জাতীয় শব্দগুলিকে আমরা অন্তত, তৃতীয়ত, ক্রমশ — এমন বানানেই লিখতে অভ্যস্ত। তাহলে **বিসর্গ দিয়ে শেষ হচ্ছে, এমন শব্দই যদি বাংলায় বেশি না থাকে তবে বিসর্গসন্ধি হবে কেমন করে?** এই প্রশ্নটার উত্তর আমাদের একটু অন্যভাবে ভেবে বের করতে হবে।

দেখো, সন্ধির নিয়ম অনুযায়ী আমরা যে-পাঁচটা সূত্রের কথা জানি সেখানে দেখেছি বাঁ দিকের

ধ্বনিগুলি সন্ধির ফলে ডানদিকে এমনভাবে বদলে যেতে পারে যে সন্ধির ফলে তৈরি নতুন ধ্বনিতে আমরা মূল শব্দের ধ্বনিকে খুঁজেই পাব না। বিসর্গসন্ধির ফলে তৈরি শব্দগুলির ক্ষেত্রে ঠিক তাই হয়। **আমরা এমন অনেক শব্দ হামেশাই ব্যবহার করি যেগুলি বিসর্গসন্ধি হয়ে তৈরি হয়েছে। অথচ এই শব্দগুলির মধ্যে যে বিসর্গ লুকিয়ে আছে, বা অন্য কোনো ধ্বনি সেজে বসে আছে - সেটা ওই ছদ্মবেশটার জন্যে চেনা যায় না।**

তোমরা বহুরূপী দেখেছ? রং মেখে, মুখোশ পরে, পোশাক চাপিয়ে কখনো সে বাঘ সাজছে তো কখনো ভালুক। একদিন ছৌ নাচে রাক্ষস সাজে তো আরেকদিন সাজে সিংহ! লোকটা কিন্তু একটাই লোক। কী করবে বেচারা ! নানারকম

না সাজলে তোমরা মজা পাবে না। বিসর্গ বেচারিরও দশাটা তেমনি।

এবার কয়েকটা শব্দ খেয়াল করো :

তপোবন, পুনরুজ্জীবন, পুরস্কার

এরপরে আমরা এই শব্দগুলিকে ভেঙে সন্ধিবিচ্ছেদ করে মূলশব্দগুলিকে দেখাব :

তপোবন = তপঃ + বন

পুনরুজ্জীবন = পুনঃ + উজ্জীবন

পুরস্কার = পুরঃ + কার

দেখতেই পাচ্ছ যে, প্রত্যেকবার প্রথম শব্দগুলি বিসর্গ দিয়ে শেষ হচ্ছে। সেই বিসর্গগুলিই সন্ধির ফলে তৈরি শব্দে নানারকম ধ্বনি সেজে বসছে। বিসর্গের এই গিরগিটির মতো বহুরূপী হয়ে রং বদলানো কেমন, সেটাও দেখে নিই :

১. (ত্ + অ + প্ + ঃ) + (ব্ + অ + ন্)

= ত্ + অ + প্ + ও + ব্ + অ + ন্ (তপোবন)
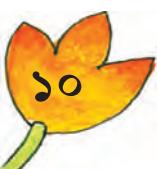
২. (প্ + উ + ন্ + অ + ঃ) + (উ + জ্ + জ্ + ঈ + ব্ + অ + ন্)

= প্ + উ + ন্ + অ + র্ + উ + জ্ + জ্ + ঈ + ব্ + অ + ন্ (পুনরুজ্জীবন)

৩. (প্ + উ+ র্ + অ + ঃ) + (ক্ + আ + র্)

= প্ + উ + র্ + অ + স্ + ক্ + আ + র্ (পুরস্কার)

তাহলে বাঁদিকে আর ডানদিকের ধ্বনিগুলো তুলনা করলেই ধরে ফেলতে পারছ যে, তিনটি শব্দের ক্ষেত্রেই দুদিকের ধ্বনির সংখ্যা এক রয়েছে। প্রথম শব্দের চার নম্বর (ঃ)-টা (ও) ধ্বনি রয়ে গেছে। দ্বিতীয় শব্দের পাঁচ নম্বর ধ্বনিটা (ঃ) এবং সন্ধির ফলে সেটা (র) হয়ে গেছে। আর তৃতীয় শব্দের পাঁচনম্বর ধ্বনি (ঃ) টা বদলে গিয়ে

(স) হয়ে গেছে। বিসর্গসন্ধির ফলে বিসর্গটির কতরকম বদল হতে পারে এবার সেগুলি সাজিয়ে নেব।

(১) বিসর্গধ্বনি (ঃ) রূপান্তরিত হয়ে (ও) হয়।

(২) বিসর্গধ্বনি (ঃ) রূপান্তরিত হয়ে (স) / (শ) / (ষ) হয়।

(৩) বিসর্গধ্বনি (ঃ) রূপান্তরিত হয়ে (র) হয়।

(৪) বিসর্গধ্বনি (ঃ) রূপান্তরিত হয়ে (´) রেফ হয়।

(৫) বিসর্গধ্বনি (ঃ) রূপান্তরের সময় লুপ্ত হয়।

(৬) বিসর্গধ্বনি (ঃ) রূপান্তরের সময় লুপ্ত হয়, কিন্তু তার আগের স্বরধ্বনিটিকে দীর্ঘ করে।

বহুরূপী বিসর্গটার আরেকটা পরিচয় দেওয়া বাকি আছে। যে সব শব্দের মধ্যে বিসর্গ (ঃ) টাকে একটা বর্ণ বা অক্ষর হিসেবে শব্দের মধ্যে দেখতে পাও, তার উচ্চারণটা খেয়াল করলে বুঝতে

পারবে সেটা কেমন অন্য ধ্বনির মতো আচরণ করছে। যেমন —

নিঃস্পন্দ	=	নিস্, স্পন্দ
দুঃখ	=	দুক্, খ
দুঃসময়	=	দুস্, সময়
স্বতঃস্ফূর্ত	=	স্বতস্, স্ফূর্ত

এবারে আমরা বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে বিসর্গসন্ধির যে ছটা নিয়মের কথা বলেছিলাম, সেগুলিকে চিনে নেব।

সূত্র : ১।। বিসর্গ রূপান্তরিত হয়ে (ও) হচ্ছে, ও-কার হচ্ছে

অধঃ + মুখ = অধোমুখ

ছন্দঃ + বদ্ধ = ছন্দোবদ্ধ

মনঃ + বাসনা = মনোবাসনা

শিরঃ + ধার্য = শিরোধার্য

মনঃ + রম = মনোরম

তিরঃ + ধান = তিরোধান

ততঃ + অধিক = ততোধিক

মনঃ + রম = মনোরস

অকুতঃ + ভয় = অকুতোভয়

নভঃ + মণ্ডল = নভোমণ্ডল

সূত্র : ২।। বিসর্গ রূপান্তরিত হয়ে (স), (শ) আর (ষ) হচ্ছে, যুক্তব্যঞ্জন হিসেবে

ভাঃ + কর = ভাস্কর

মনঃ + কামনা = মনস্কামনা

স্রোতঃ + বান = স্রোতস্বান

নিঃ + তেজ = নিস্তেজ

পুরঃ + কার = পুরস্কার

তিরঃ + কার = তিরস্কার

সরঃ + বতী = সরস্বতী

মনঃ + তাপ = মনস্তাপ

* এই উদাহরণগুলিতে (স) ধ্বনিতে রূপান্তর ঘটেছে।

নিঃ + চয় = নিশ্চয়

নিঃ + চিন্ত = নিশ্চিন্ত

অয়ঃ + চক্র = অয়শ্চক্র

নভঃ + চর = নভশ্চর

নিঃ + ছিদ্র = নিশ্ছিদ্র

দুঃ + চিন্তা = দুশ্চিন্তা

নিঃ + চেষ্ট = নিশ্চেষ্ট

মনঃ + চক্ষু = মনশ্চক্ষু

* এই উদাহরণগুলিতে (শ) ধ্বনিতে রূপান্তর ঘটেছে।

নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর

নিঃ + প্রয়োজন = নিষ্প্রয়োজন

নিঃ + কাম = নিষ্কাম

পরিঃ + কার = পরিষ্কার

চতুঃ + পার্শ্ব = চতুষ্পার্শ্ব

দুঃ + কর = দুষ্কর

ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার

নিঃ + কৃতি = নিষ্কৃতি

নিঃ + ফল = নিষ্ফল

আবিঃ + কার = আবিষ্কার

চতুঃ + পদ = চতুষ্পদ

ভ্রাতুঃ + পুত্রী = ভ্রাতুষ্পুত্রী

* এই উদাহরণগুলিতে (ষ) ধ্বনিতে রূপান্তর ঘটেছে।

সূত্র : ৩।। বিসর্গ রূপান্তরিত হয়ে (র) হচ্ছে

অন্তঃ + ইন্দ্রিয় = অন্তরিন্দ্রিয়

অন্তঃ + আত্মা = অন্তরাত্মা

নিঃ + অতিশয় = নিরতিশয়

নিঃ + আকার = নিরাকার

নিঃ + আনন্দ = নিরানন্দ

নিঃ + ঈহ = নিরীহ

নিঃ + আমিষ = নিরামিষ

দুঃ + অবস্থা = দুরবস্থা

পুনঃ + অপি = পুনরপি

প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ

পুনঃ + আবিষ্কার = পুনরাবিষ্কার

নিঃ + অবধি = নিরবধি

দুঃ + আত্মা = দুরাত্মা

নিঃ + অঙ্কুশ = নিরঙ্কুশ

নিঃ + উদ্বেগ = নিরুদ্বেগ

চতুঃ + অঙ্গ = চতুরঙ্গ

সূত্র : ৪।। বিসর্গ রূপান্তরিত হয়ে (́) রেফ হচ্ছে, রেফটি পরের ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়

জ্যোতিঃ + বিজ্ঞান = জ্যোতির্বিজ্ঞান

পুনঃ + বার = পুনর্বার

অহঃ + নিশ = অহর্নিশ

বহিঃ + জগৎ = বহির্জগৎ

দুঃ + দান্ত = দুর্দান্ত

দুঃ + ধর্ষ = দুর্ধর্ষ

নিঃ + মোহ = নির্মোহ

নিঃ + নয় = নির্ণয়

অন্তঃ + লীন = অন্তর্লীন

অন্তঃ + গত = অন্তর্গত

নিঃ + লোভ = নির্লোভ

নিঃ + বিকার = নির্বিকার

সূত্র : ৫।। বিসর্গ রূপান্তরিত হয়ে লুপ্ত হচ্ছে

অতঃ + এব = অতএব

সদ্যঃ + পাতি = সদ্যপাতি

সদ্যঃ + উত্থিত = সদ্যউত্থিত

নিঃ + স্তব্ধ = নিস্তব্ধ

মনঃ + স্থ = মনস্থ

নিঃ + স্পন্দ = নিস্পন্দ

যশঃ + ইচ্ছা = যশইচ্ছা

সদ্যঃ + উচ্চারিত = সদ্যউচ্চারিত
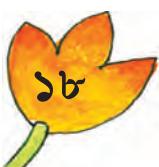
সদ্যঃ + উদ্ভূত = সদ্যউদ্ভূত

সূত্র : ৬।। বিসর্গ লুপ্ত হয়ে আগের স্বরধ্বনিকে দীর্ঘ করছে

নিঃ + রব = নীরব

নিঃ + রোগ = নীরোগ

নিঃ + রস = নীরস

চক্ষুঃ + রোগ = চক্ষূরোগ

স্বঃ + রাজ্য = স্বারাজ্য

নিঃ + রন্ধ্র = নীরন্ধ্র

সূত্র : ৭ ।। বিসর্গ পরিবর্তিত না হয়ে এক থেকে গেছে

মনঃ + ক্ষুণ্ণ = মনঃক্ষুণ্ণ

দুঃ + সাধ্য = দুঃসাধ্য

স্বতঃ + সিদ্ধ = স্বতঃসিদ্ধ

প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল

স্রোতঃ + পথ = স্রোতঃপথ

অন্তঃ + পুর = অন্তঃপুর

হা
তে
ক
ল
মে

১.সন্ধিতে কতরকম নিয়মে দুটি ধ্বনি যুক্ত হয়? এই নিয়মগুলির প্রত্যেকটি একটি করে উদাহরণ দিয়ে দেখাও। বিসর্গসন্ধির ক্ষেত্রে কোন নিয়ম খাটে?

২.বিসর্গসন্ধির ফলে বিসর্গটি কোন কোন ধ্বনিতে রূপান্তরিত হতে পারে? প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৩.নীচে উল্লিখিত বাক্য থেকে বিসর্গ সন্ধিযুক্ত পদগুলিকে চিহ্নিত করো :

৩.১ অহোরাত্র পরিশ্রম করে শেষে তার পুরস্কার পেলাম।

৩.২ নিরামিষ নানা পদ দিয়ে প্রাতরাশ সারলেন।

৩.৩ দুরবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে মনোবাসনা পূর্ণ হতে পারে।

৩.৪ চতুষ্পার্শ্ব পরিষ্কার রাখলে মশার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

৩.৫ নিস্তব্ধ বাড়িতে বসে দুর্দান্ত সব জোতির্বিজ্ঞানের আবিষ্কার করেন।

৪.নীচের পদগুলিকে বিসর্গসন্ধির নিয়মে বিশ্লেষণ করো :

মনোবাঞ্ছা, সরোজ, নিরীশ্বর, আবিষ্কার, অহর্নিশ, পরিষ্কার, চতুরানন, নির্মোহ

৫.বিসর্গসন্ধিতে কীভাবে বিসর্গ(ঃ) টি কখনো(র) ধ্বনিতে বা কখনো (র্) রেফ-এ রূপান্তরিত হয়—দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাও।

৬.**(শ), (ষ), (স)**— বিসর্গসন্ধির ফলে কীভাবে সন্ধিবদ্ধ পদে এই তিনটি ধ্বনি সৃষ্টি হয়—দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শব্দের গঠন

১. শব্দগঠন : মৌলিক শব্দ ও যৌগিক শব্দ

সভ্যতার ইতিহাসে মানুষ আগে কথা বলতে শিখেছে। লিখতে শিখেছে আরো অনেক পরে। একটি শিশুও তাই প্রথমে অন্যদের কথা শোনে। তারপর তার অনুকরণ করে কিছু কিছু উচ্চারণ করতে চায়। লিখতে এবং পড়তে শেখে একটু একটু করে বড়ো হলে।

কথা বলার **শব্দ**গুলি তাই তৈরি হয় মুখের ভাষার **ধ্বনি** দিয়ে। এগুলি দু-রকম : স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি।

লেখার ভাষার **শব্দ**গুলি প্রকাশ করতে হয় সেইসব ধ্বনির লিপিরূপ দিয়ে। এগুলিকে বলা হয় **বর্ণ** বা **অক্ষর**।

একটি শব্দের গঠনে একটি ধ্বনি যেমন থাকতে পারে, তেমনি একাধিক ধ্বনিও থাকতে পারে। আবার শব্দটিকে যেসব বর্ণ দিয়ে লিখি, শব্দটির উচ্চারণে অন্য ধ্বনি থাকতে পারে। যেমন :

একটি — এখানে ‘এ’ বর্ণটির উচ্চারণ ‘এ’ ধ্বনির মতো

একটা — এখানে ‘এ’ বর্ণটির উচ্চারণ ‘অ্যা’ ধ্বনির মতো

অবাক — এখানে ‘অ’ বর্ণটির উচ্চারণ ‘অ’ ধ্বনির মতো

অতি — এখানে ‘অ’ বর্ণটির উচ্চারণ ‘ও’ ধ্বনির মতো

এবার দেখে নিই বিভিন্ন শব্দের গঠনে কীভাবে ধ্বনিগুলি থাকে :

ও — ও (একটি স্বরধ্বনির সাহায্যে গঠিত)

চা — চ্ + আ

(একটি স্বর + একটি ব্যঞ্জন = দুটি ধ্বনি)

অভীক — অ + ভ্ + ঈ + ক্

(দুটি স্বর + দুটি ব্যঞ্জন = চারটি ধ্বনি)

প্রজাপতি — প্ + র্ + অ+ জ্ + আ + প্ + অ + ত্ +ই (পাঁচটি ব্যঞ্জন + চারটি স্বর = নটি ধ্বনি)

উচ্চারণ করার সময় : ও, চা, দে, স্ত্রী, বল্, দিক, চুল, প্রায় — এই শব্দগুলি আমরা একবারের চেষ্টাতেই উচ্চারণ করে ফেলতে পারি।

কিন্তু শব্দ যদি মাঝারি বা বড়ো আকারের হয়, তাহলেই আর সেগুলো একবারের চেষ্টায় উচ্চারণ করা যায় না। যেমন :

কোন্দল : কোন্, দল্ (২টি)

কোলাহল : কো, লা, হল্ (৩টি)

চঞ্চলতা : চন্, চ, ল, তা (৪টি)

কলাকুশলী : ক, লা, কু, শ, লী (৫টি)

আরব্যরজনি : আ, রোব্, বো, র, জ, নি (৬টি)

অতিবেগুনিরশ্মি : অ, তি, বে, গু, নি, রোশ্, শি (৭টি)

এইভাবে শব্দের উচ্চারণের সময় যে ভাঙা টুকরোগুলি পেলাম (যেমন : শ, রোব্, জ, নী, রোশ্) সেগুলির কোনো অর্থ হয় না। এগুলি কেবল এক একবারে যতটা করে উচ্চারণ করা যায়, ততটুকু অংশ। এবার যদি অর্থের দিকে তাকাও তাহলে দেখো শব্দগুলি কেমন হচ্ছে :

অতিবেগুনিরশ্মি : অতি বেগুনি রশ্মি

আরব্যরজনি	:	আরব্য রজনি
কলাকুশলী	:	কলা কুশলী
চঞ্চলতা	:	চঞ্চলতা
কোলাহল	:	কোলাহল
কোন্দল	:	কোন্দল

প্রথম তিনটির ক্ষেত্রে একের বেশি শব্দ জুড়ে ছিল। শেষ তিনটি শব্দে ওরকম গোটা গোটা শব্দ জুড়ে নেই। কিন্তু শেষ তিনটি শব্দও কোনো কোনো টুকরো জুড়ে তৈরি হয়েছে। যেমন :

চঞ্চলতা : √ চঞ্চ্ + অল + তা

কোলাহল : কোলা (√ কুল্ +আ) হল (√ হল্ + অচ্)

কোন্দল : √ কন্দি + অল

আবার তার আগের শব্দগুলিতেও কুশলী, রশ্মি, রজনী — এই শব্দগুলিকেও আরও ভেঙে

টুকরো করা যায়। (√ চঞ্চ্, √ কুল্ জাতীয় ভাঙাগুলি কী বোঝাচ্ছে, তা পরে বলা হবে।)

তাহলে দেখো বাংলায় এমন অনেক শব্দ রয়েছে যেগুলি দুটি বা দুইয়ের বেশি শব্দ জুড়ে তৈরি হয়েছে। আবার যে শব্দগুলিকে একটা শব্দ বলে মনে হচ্ছে সেগুলিকেও নানাভাবে আরও ছোটো টুকরো করা যায়।

সুতরাং যেসব শব্দকে ভাঙলে ছোটো কয়েকটি অর্থপূর্ণ শব্দ বা অন্যক্ষেত্রে মূল শব্দটির সঙ্গে অর্থ সম্পর্কযুক্ত শব্দাংশ বা খণ্ড পাওয়া যায়, সেগুলিকে বলা হয় **সাধিত শব্দ** বা **যৌগিক শব্দ**। যেমন : আপাদমস্তক, খামচাখামচি, মুশকিলআসান, ডাক্তারবাবু, বিয়েবাড়ি, ফুটন্ত, বিত্তবান, বাঁদরামি, খাইয়ে, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি।

সাধিত শব্দগুলি যেভাবে গঠিত হয় সেই অনুযায়ী এগুলিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় :

(১) জোড়বাঁধা সাধিত শব্দ : দুই বা দুইয়ের বেশি শব্দ জুড়ে যখন একটি সাধিত শব্দে রূপান্তরিত হয়, তখন সেগুলি জোড়বাঁধা সাধিত শব্দ। এগুলিকেও আবার দুটো ভাগ করা যায়—

(১.১) শব্দদুটির সন্ধি হয়েছে এমন সাধিত শব্দ	(১.২) শব্দদুটির সন্ধি হয়নি এমন সাধিত শব্দ
বাগাড়ম্বর, দশানন, বিদ্যালয়, নীলাম্বর, গ্রন্থাগার, সিংহাসন	তেলেভাজা, পটলতোলা, জলখাবার গোঁসাইবাগান, দিনকাল, হাটবাজার

(২) শব্দখণ্ড বা শব্দাংশ জুড়ে সাধিত শব্দ : শব্দের সঙ্গে বা ধাতুর সঙ্গে শব্দাংশ বা খণ্ড জুড়ে একটি সাধিত শব্দে রূপান্তরিত হয়, এগুলিও দু-রকম হয়—

(২.১) শব্দের সঙ্গে শব্দাংশ জুড়ে সাধিত শব্দ :

—তম	প্রিয় + তম = প্রিয়তম, ক্ষুদ্র + তম = ক্ষুদ্রতম, শ্রেষ্ঠ + তম = শ্রেষ্ঠতম
— ইক	সমুদ্র + ইক = সামুদ্রিক, মাস + ইক = মাসিক, ধর্ম + ইক = ধার্মিক
—তা	ব্যর্থ + তা = ব্যর্থতা, নীচ + তা = নীচতা, সহযোগী + তা = সহযোগিতা
—আই	খাড়া + আই = খাড়াই, বড়ো + আই = বড়াই, চোর + আই = চোরাই
— ময়	দয়া + ময় = দয়াময়, জল + ময় = জলময়, স্বপ্ন + ময় = স্বপ্নময়

(২.২) ধাতুর সঙ্গে শব্দাংশ জুড়ে সাধিত শব্দ :

যেসব শব্দ দিয়ে কোনো কাজ করা (ক্রিয়া) বোঝায়, সেগুলির মূল অংশ বা সার অংশকে বলে ধাতু। এগুলিকে আমরা আগে √ —চিহ্নটির সাহায্যে দেখিয়েছি। √ কর্, √ চল্, √ খা — এরকম অনেক ধাতুরূপ রয়েছে। এগুলির শেষেও নানা শব্দাংশ জুড়ে সাধিত শব্দ তৈরি করে—

—অক	√ দৃশ্ + অক = দর্শক, √ নৈ + অক = নায়ক,
	√ পঠ্ + অক = পাঠক
— অন্ত	√ ফুট্ + অন্ত = ফুটন্ত, √ জ্বল্ + অন্ত = জ্বলন্ত,
	√ ডুব্ + অন্ত = ডুবন্ত
—ই	√ হাস্ + ই = হাসি, √ ঝুঁক্ + ই = ঝুঁকি,
	√ ফির্ + ই = ফিরি

এতক্ষণ ধরে যত শব্দ দেখলে সবগুলি তাহলে ভাঙা যাচ্ছে আর টুকরোগুলি অর্থপূর্ণ হচ্ছে, তাই এগুলি সবই সাধিত বা যৌগিক শব্দ। কিন্তু এছাড়াও আরও এক ধরনের শব্দগঠন আমরা দেখতে পাব।

যেসব শব্দকে আর ভাঙা যায় না বা শব্দটির থেকে ছোটো খণ্ডে ভাঙলে তার আর কোনো অর্থ পাওয়া সম্ভব নয়, সেই জাতীয় অবিভাজ্য শব্দগুলিকে সিদ্ধ শব্দ বা মৌলিক শব্দ বলে।

এরকম মৌলিক শব্দের উদাহরণ হলো :
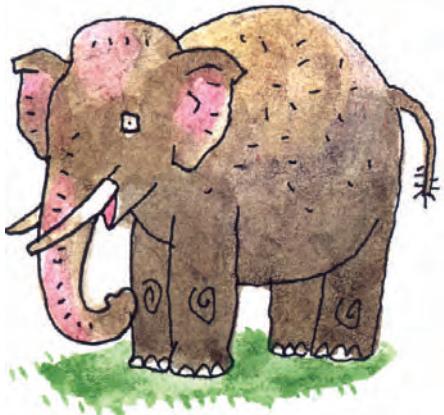
লাল, নীল, সাদা, কালো, হলুদ, সবুজ

হাত, পা, মুখ, মাথা, নাক,চোখ, কান

এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট

দিন, রাত, হাতি, ঘোড়া, জল, বাবা, মা ইত্যাদি আরও অসংখ্য শব্দ।

এই শব্দগুলিকে যদি ভাঙো তবে যে টুকরোগুলি পাওয়া যাবে, তার কোনো অর্থ হয় না।

যেমন : মাথা (মা + থা), হাতি (হা + তি), বাবা (বা + বা)।

সুতরাং শব্দের গঠন অনুযায়ী আমরা দুটো ভাগ পেলাম : **যৌগিক/সাধিত শব্দ** আর **মৌলিক/সিদ্ধ শব্দ।**

এবার দেখব যে অর্থ অনুযায়ীও শব্দকে ভাগ করা হয়। এইভাবে ভাগ করে শব্দের আরও তিনটি শ্রেণির কথা বলা হয়।

এখানে আরেকটা নতুন শব্দ জানব। সেটা হলো শব্দের **ব্যুৎপত্তিগত অর্থ** (ইংরেজিতে একে বলে etymological meaning বা বিষয়টিকে বলে etymology। সাধিত শব্দের মূল অংশ এবং সংযুক্ত খণ্ড অংশগুলিকে যেভাবে ভেঙেছিলে তার সাহায্যে সেই শব্দটির যে উৎপত্তি বোঝা যায়, তাকে বলে ব্যুৎপত্তি। সেভাবে শব্দটির যে অর্থ জানা যায় তাকে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলে। কোনো কোনো শব্দের মানে সেই ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সঙ্গে এক থাকলেও কোনো কোনো শব্দের মানে আবার বদলেও যায়। ব্যুৎপত্তিগত অর্থটাই সেই শব্দের আদি অর্থ বা মূল অর্থ। কিন্তু অনেক সময় তা পালটে গিয়ে এখন আমরা শব্দটার যে মানে বুঝি, তাকে বলব **প্রচলিত অর্থ** বা **ব্যবহারিক অর্থ**।

এবার এই **ব্যুৎপত্তিগত অর্থ** আর **প্রচলিত অর্থ** — এই দুটির মধ্যে তিনরকম সম্পর্ক থেকে শব্দগুলিকে তিনরকম শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এই ভাগগুলির বৈশিষ্ট্য হলো—

শব্দের শ্রেণি	শব্দের বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
অপরিবর্তিত যৌগিক শব্দ	এই জাতীয় সাধিত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও প্রচলিত অর্থ একই রয়েছে।	**পাঠক = √পঠ্ + অক** ‘পঠ্’ হলো পাঠ করা বা পড়া এবং ‘অক’ বলতে কর্তৃত্ব বোঝায়। এর মানে হলো পাঠকর্তা বা যিনি পাঠ করেন। সুতরাং, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যা ছিল প্রচলিত অর্থও তাই।

শব্দের শ্রেণি	শব্দের বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
পরিবর্তিত যৌগিক শব্দ	এই জাতীয় শব্দগুলির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের থেকে প্রচলিত অর্থ এতটাই আলাদা হয়ে গেছে যে মূলরূপের সঙ্গে ব্যবহারিক রূপের সম্পর্ক নেই বলে মনে হয়।	**মহাজন**-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যে ব্যক্তি মহান বা মহৎ। (যেমন : মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ) কিন্তু এর প্রচলিত অর্থ হয়ে গেছে সুদব্যবসায়ী, অর্থাৎ যে টাকা ধার দিয়ে চড়া সুদ নেয়। সুতরাং, তাকে মহান ব্যক্তি নিশ্চয়ই বলা যায় না।

শব্দের শ্রেণি	শব্দের বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
সংকুচিত যৌগিক শব্দ	এই জাতীয় সাধিত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনেক কিছু বা ব্যাপকতা বোঝালেও প্রচলিত অর্থ তারই মধ্যে কোনোটিকে বোঝায় বা অর্থে প্রয়োগ হয়।	**তুরঙ্গম** -এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো যা-কিছু দ্রুতগমন করতে পারে বা তাড়াতাড়ি যেতে পারে। যেহেতু দ্রুতগামী প্রাণী তাই এর প্রচলিত অর্থ হলো **ঘোড়া**।

এই জাতীয় আরও কিছু শব্দের উদাহরণ :

শব্দ	ব্যুৎপত্তিগত অর্থ	প্রচলিত অর্থ	শব্দশ্রেণি
অন্ন	যে-কোনো খাদ্যবস্তু	ভাত	যৌগিক সংকুচিত
পান	গাছের পাতা (পর্ণ)	তাম্বুল	যৌগিক সংকুচিত
মৃগ	বনের পশু	হরিণ	যৌগিক সংকুচিত
প্রদীপ	যে-কোনো আলো	নির্দিষ্ট আকারের মাটি বা ধাতুর আলোকপাত্র	যৌগিক সংকুচিত
পঙ্কজ	যা পাঁকে জন্মায়	পদ্মফুল	যৌগিক সংকুচিত
আদিত্য	দেবমাতা অদিতির পুত্র সব দেবতা	সূর্যদেব	যৌগিক সংকুচিত
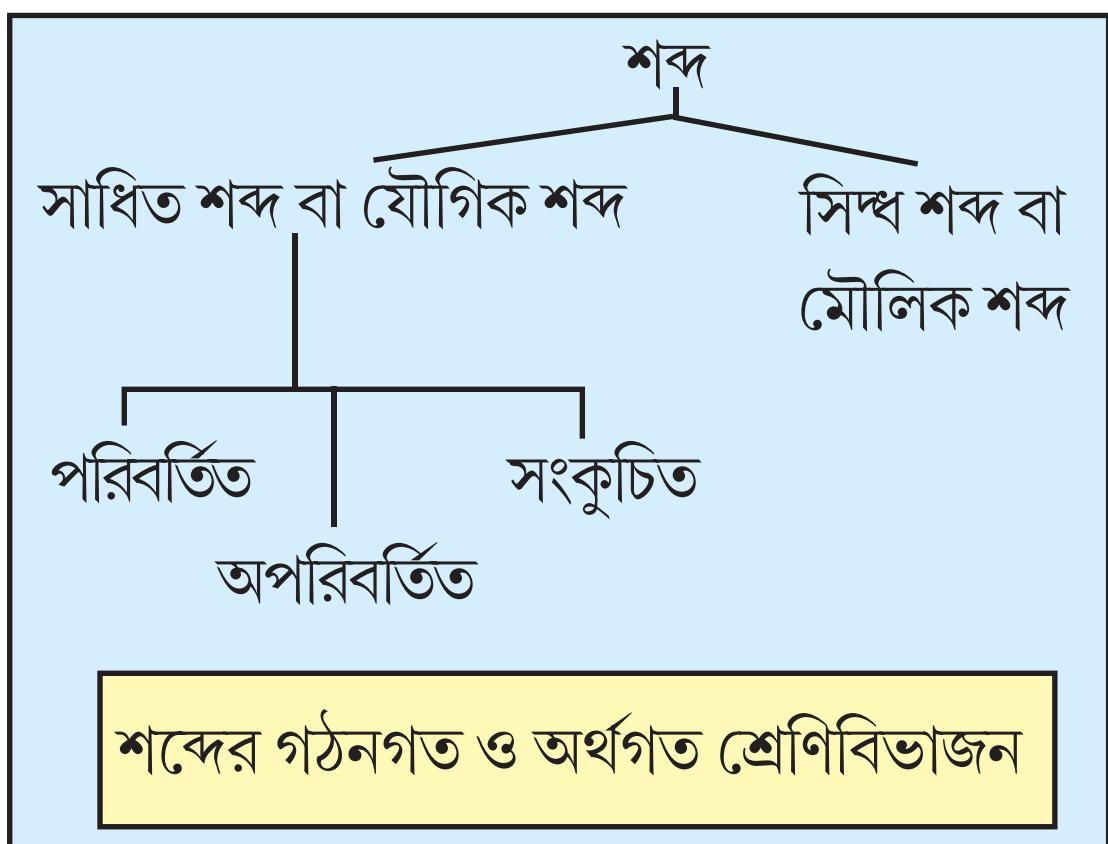
শব্দ	ব্যুৎপত্তিগত অর্থ	প্রচলিত অর্থ	শব্দশ্রেণি
জলদ	যা জল দান করতে পারে	মেঘ	যৌগিক সংকুচিত
মন্দির	যে-কোনো গৃহ/বাসস্থান	দেবতার গৃহ	যৌগিক সংকুচিত
কুশল	যে কুশ তুলতে পারে	নিপুণ/পারদর্শী/মঙ্গল	যৌগিক পরিবর্তিত
প্রবীণ	যিনি বীণা বাজাতে পটু	বয়স্ক ব্যক্তি	যৌগিক পরিবর্তিত
সন্দেশ	সংবাদ/খবর	মিষ্টি খাবার	যৌগিক পরিবর্তিত
গোষ্ঠী	গোরুর থাকার জায়গা /গোয়াল	দল/সমূহ	যৌগিক পরিবর্তিত
গবাক্ষ	গোরুর চোখ	জানালা	যৌগিক পরিবর্তিত
ঝি	কন্যা/মেয়ে	পরিচারিকা	যৌগিক পরিবর্তিত
জলপানি	জলখাবার/ লঘুভোজন	ছাত্রবৃত্তি	যৌগিক পরিবর্তিত

শব্দ	ব্যুৎপত্তিগত অর্থ	প্রচলিত অর্থ	শব্দশ্রেণি
গবেষণা	গোরু খোঁজা	গভীর বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান	যৌগিক পরিবর্তিত
জলজ	যা কিছু জলে জন্মায়	একই	যৌগিক অপরিবর্তিত
পালনীয়	যা পালন করা উচিত	একই	যৌগিক অপরিবর্তিত
ধীরগামী	যা ধীরে ধীরে যাচ্ছে	একই	যৌগিক অপরিবর্তিত

তাহলে গঠন অনুযায়ী আর অর্থ অনুযায়ী শব্দকে যেমনভাবে ভাঙা হয় তেমন একটি শাখাচিত্র তৈরি করে মনে রাখি :

- শব্দ
  - সাধিত শব্দ বা যৌগিক শব্দ
    - পরিবর্তিত
    - অপরিবর্তিত
    - সংকুচিত
  - সিদ্ধ শব্দ বা মৌলিক শব্দ

শব্দের গঠনগত ও অর্থগত শ্রেণিবিভাজন

২. সংখ্যাবাচক শব্দ

সংখ্যা শুধু অঙ্ক করার জন্য আমাদের জানতে হয় এমন নয়। দিন, বছর, মাস, জিনিসপত্রের দাম, কোনো কিছুর পরিমাণ, দূরত্ব বা ওজন, বয়স
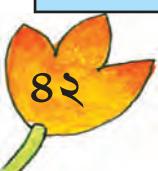
— এমনই অনেককিছুর সঙ্গে সংখ্যার সম্পর্ক। আমাদের প্রতিদিনের জীবন নানারকম সংখ্যা ছাড়া অচল। নানা ভাষাতে তাই সংখ্যার নানারকম নাম পাওয়া যায়। এরকম কয়েকটা ভারতীয় ভাষায় সংখ্যাগুলির নাম কেমন হয়, দেখো :

বাংলায়	হিন্দি/উর্দু	ওড়িয়া	গুজরাটি	সংস্কৃত
এক্	ইক্	গোটে	এক্	এক
দুই	দো	বেণি	বে	দ্বি
তিন	তিন্	তিনি	ত্রাণ্	ত্রি

দশ পর্যন্ত সংখ্যার নাম কতরকম হয়, দেখো :

ইংরেজি	তামিল	আরবি	চিনা
ওয়ান	ওণ্‌রবু	আহাদুন	ই
টু	এর্‌রাণ্ডু	ইসনা উন্	নি

ইংরেজি	তামিল	আরবি	চিনা
থ্রি	মুনরু	সালসাতুন	শ্যাম
ফোর	নান্ গু	আরবাতুন	শি
ফাইভ	আইন্ দু	খামসুন্	উম
সিক্স	আরু	সেত্তাতুন	লু
সেভেন	এলু	সবা’তুন	চি
এইট	এট্টু	সমানিয়াতুন	প্যাট্
নাইন	ওন্বাদু	তিস্আ’তুন	কিউ
টেন	পাট্ঠু	আশর্তুন্	সুব

গ্রন্থঋণ : শ্রী পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য — বাংলাভাষা

এখানে যেমন নানা ভাষায় সংখ্যাগুলির নানারকম নাম পেলাম, তেমনই কিন্তু প্রত্যেক ভাষাতেই সংখ্যা লিখতে সংখ্যাচিহ্ন ব্যবহার করা হয় আমাদেরই মতো। অর্থাৎ একটা সংখ্যার

অন্তত দুটো পরিচয় --- প্রথমে তার চিহ্ন; তারপরে তার নাম।

চলো, চট করে চেনা জিনিসের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা দেখে নিই —

সংখ্যা চিহ্ন	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
সংখ্যার নাম	এক	দুই	তিন	চার	পাঁচ	ছয়	সাত	আট	নয়

এখানে আমরা এককের ঘরের সংখ্যাগুলিকে দেখলাম। বাংলায় এই মূল সংখ্যাগুলির নামের বৈশিষ্ট্য হলো — প্রত্যেকটিই একবারের চেষ্টায় উচ্চারণ করতে পারি (অর্থাৎ এগুলি সব একদলবিশিষ্ট শব্দ)। যেই সংখ্যাগুলি বড়ো হয়ে দশক বা শতকের ঘরের সংখ্যা হবে, সঙ্গে সঙ্গে শব্দগুলি উচ্চারণ করতে একের বেশিবার চেষ্টা

করতে হবে। (ব্যতিক্রম হলো : দশ, বিশ, ত্রিশ, ষাট এই শব্দ চারটি) যেমন : পনেরো (প, নে, রো), ছাপ্পান্ন (ছাপ্, পান্, ন), একশো পঁচিশ (এক, শো, পঁ, চিশ) ইত্যাদি।

সংখ্যাচিহ্ন ব্যবহার করে সংখ্যা লিখলেও আমরা সেই সংখ্যাগুলিকে যেসব নাম দিয়েছি সেগুলি বিশুদ্ধ গণনা সংখ্যা কিংবা ভগ্নাংশ, সবক্ষেত্রেই নামবাচক শব্দগুলিকে সংখ্যাশব্দ বা সংখ্যাবাচক শব্দ বলা হয়।

সংখ্যাশব্দগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) বিশুদ্ধ সংখ্যাশব্দ বা গণনা সংখ্যাশব্দ :

বাংলায় এক থেকে একশো পর্যন্ত প্রত্যেকটি শব্দের নাম আলাদা। এর আগে উল্লেখ করা যায় 'শূন্য' শব্দনামটিকে। একশোর পর আবার

‘হাজার’, ‘লক্ষ’ এবং ‘কোটি’ শব্দ তিনটিকে ধরলে এগুলির সাহায্যেই সব সংখ্যার নাম বুঝিয়ে দেওয়া যায়। আগে ‘অযুত’ এবং ‘নিযুত’ শব্দদুটির প্রচলন থাকলেও এখন আর নেই। সেক্ষেত্রে বিশুদ্ধ সংখ্যাশব্দ হচ্ছে ১০৪টি।

আগেকার দিনে চোক, পন, ছটাক, কড়া, গন্ডা — এমন কিছু শব্দও ব্যবহৃত হতো সংখ্যাবাচক হিসেবে। মহাভারতে সৈন্যসংখ্যা অনুযায়ী অক্ষৌহিণী, অনীকিনী জাতীয় সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দেরও ব্যবহার দেখা যায়। এগুলির আর এখন কোনো চল নেই।

বাংলা সংখ্যাবাচক শব্দের মধ্যে কিছু কিছু শব্দ দেশজ বা অনার্য উৎস থেকে আসছে। বেশিরভাগ সংখ্যাশব্দই আসলে আর্যভাষা কিংবা সংস্কৃত ভাষা থেকে পরিবর্তনের ফলে তৈরি হওয়া **তদ্ভব** জাতীয় একধরনের শব্দ।

দুই অঙ্কের সংখ্যাগুলির ক্ষেত্রে বাংলা সংখ্যাশব্দে দেখবে আগে এককের ঘর এবং পরে দশকের ঘরের নাম আমরা বলে থাকি। যেমন : ৩১ যখন সংখ্যায় লিখি তখন দশকের ঘরে ৩ আগে, আর এককের ঘরে ১ পরে বসাই। কিন্তু এই সংখ্যাটিকে কথায় বলছি 'এক তিরিশ'। তাহলে এককের ঘরের সংখ্যাটা আগে বলে দশকের ঘরের নামটা পরে বলছি। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় এই সংখ্যাটার নামশব্দ 'থারটি ওয়ান' — যেখানে আগের নামটা (দশক) আগে, আর পরের নামটা পরে (একক) বলা হচ্ছে। আবার শতকের ঘরের ক্ষেত্রে দেখো শতকের নামটা আগেই বলা হলো। একশো এক তিরিশ। অর্থাৎ 'শতক-একক-দশক' এইভাবে সংখ্যাশব্দটা বলা হচ্ছে। হাজার, লক্ষ বা কোটির ক্ষেত্রেও বাঁদিকে সংখ্যাটি যেভাবে বাড়ে তার নামটাও সেভাবেই

বলা হয়। এক কোটি চৌতিরিশ লক্ষ সাত হাজার তিনশো সাতানব্বই (১,৩৪,০৭,৩৯৭)। তাহলে বাংলা দু-অঙ্কের সংখ্যার নামগুলিতে দশকের পর একক না বলে এককের পর দশক --- এভাবেই সংখ্যাবাচক শব্দগুলি তৈরি হয়েছে।

দশের ঘরের সংখ্যাশব্দগুলির মধ্যে দুটি ছাড়া (চোদ্দো, ষোলো) সবই -'র' দিয়ে শেষ হচ্ছে। কুড়ির ঘরের সংখ্যাশব্দগুলি সবই - শ/ - ইশ/ -আশ/-উশ দিয়ে শেষ হচ্ছে।

তিরিশের ঘরে : -ত্রিশ/-তিরিশ দিয়ে (ব্যতিক্রম উনচল্লিশ)

চল্লিশের ঘরে : -ল্লিশ/-চল্লিশ দিয়ে (ব্যতিক্রম : উনপঞ্চাশ)

পঞ্চাশের ঘরে : -ন্ন দিয়ে (ব্যতিক্রম উনষাট)

ষাটের ঘরে	:	-ষট্টি দিয়ে (ব্যতিক্রম উনসত্তর)
সত্তরের ঘরে	:	-ত্তর দিয়ে (ব্যতিক্রম উনআশি)
আশির ঘরে	:	-আশি দিয়ে (ব্যতিক্রম উননব্বই)
নব্বইয়ের ঘরে	:	-নব্বই দিয়ে

১৯, ২৯, ৩৯, ৪৯, ৫৯, ৬৯, ৭৯, ৮৯ — এই সংখ্যাশব্দগুলির একটু বিশেষত্ব আছে। খেয়াল করে দেখো প্রত্যেকটার নামের শুরুতে 'ঊন' শব্দাংশটা বসছে। ঊন কথাটার মানে হলো : কিছুটা কম বা ন্যূন। তাহলে উনষাট মানে হলো ষাটের চেয়ে কম। বাকিগুলিও তাই। এবার দেখো তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ সবগুলির ঘরে সংখ্যার নাম যেমনভাবে বাড়ছিল তাতে সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ-এর পর নয়ত্রিশ হতে পারত।

একইভাবে নয়চল্লিশ, নয়পঞ্চাশ, নয়ষাট ইত্যাদির বদলে সংখ্যাশব্দগুলির নামের মধ্যে পরের দশকটির সংখ্যাশব্দের নাম ঢুকে উনপঞ্চাশ, উনষাট, উনসত্তর হয়ে যাচ্ছে। ঊনকুড়ি না বলে যে উনিশ বলছি, কারণ ঊনবিংশ থেকে ঊনবিশ, এভাবে ক্রমে শব্দটা ছোটো হয়ে উনিশ হয়ে গেছে। তবে দেখো আগের তালিকায় একটা সংখ্যা লিখিনি - ৯৯ ; এটাকে আমরা বলি নিরানব্বই — আমরা কিন্তু ঊনশো বলি না। তাহলে 'ঊন' সংখ্যাশব্দগুলির মধ্যে এটার নামে একটা ব্যতিক্রম থাকছে।

বাংলায় মৌলিক বা বিশুদ্ধ সংখ্যাবাচক শব্দগুলি বিশেষ্য পদের আগে বসে সেটির সংখ্যা নির্দেশ করে। যেমন : শতবর্ষ, দেড়শো বছর, পাঁচ মাথার মোড়, সাত দিন, হাজার তারা, সাত কোটি সন্তান ইত্যাদি। সংখ্যাশব্দগুলি এক্ষেত্রে

বিশেষণ পদের মতো বিশেষ্যর বৈশিষ্ট্য বোঝায়। ইংরেজির অনুসরণে আবার রজতজয়ন্তী, সুবর্ণজয়ন্তী, হীরকজয়ন্তী শব্দগুলিও বাংলায় বছরের সংখ্যাই বোঝায়। বারো সংখ্যাটিকে আমরা ইংরেজির ডজন অর্থেও ব্যবহার করি।

সংখ্যাবাচক শব্দের শেষে কতকগুলি নির্দেশক শব্দও বসানো হয়। এগুলি হলো : টো, টে, টি, টা, খানা, খানি, গাছা, গাছি জাতীয় খণ্ডশব্দ। এগুলি সংখ্যাকে আরও নির্দিষ্টভাবে বোঝায়। যেমন: তিনটি, পাঁচখানা, সাতগাছি, দুটো, চারটে ইত্যাদি। এখানে আবার তরীখানা, ছেলেটি, লোকটা, দড়িগাছা — এই জাতীয় শব্দে দেখো সংখ্যার উল্লেখ না থাকলেও বোঝা যাচ্ছে যে একটিকেই কিন্তু বোঝানো হচ্ছে। আবার বন্ধুরা, গাছগুলো, পাতাগুলি — এই জাতীয় শব্দে একের বেশি বোঝাচ্ছে।

(২) ভগ্নাংশিক সংখ্যাশব্দ :

এই জাতীয় সংখ্যাবাচক শব্দগুলির মধ্যে কয়েকটি ভগ্নসংখ্যাবাচক বিশেষণ যেগুলি ভগ্নাংশ জাতীয় সংখ্যা হলেও আলাদা নাম রয়েছে।

আধ/আধা - ($\frac{১}{২}$) বোঝায়। আধলা, আধাখ্যাঁচড়া, আধখানা, আধপাগল ইত্যাদি।

সাড়ে - এক আর দুই ছাড়া নিরানব্বই পর্যন্ত সব সংখ্যার পূর্ণমান যোগ অর্ধেক বোঝাতে বিশুদ্ধ সংখ্যাশব্দের আগে এটি বিশেষণ হিসেবে বসে।

সাড়ে চারটে - চার ঘণ্টা + এক ঘণ্টার অর্ধেক ($৪\frac{১}{২}$)

সাড়ে আট টাকা - আট টাকা + এক টাকার অর্ধেক ($৮\frac{১}{২}$)

তেহাই - তিন ভাগের একভাগ ($\frac{১}{৩}$) বোঝায়। তালের মান বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

দেড় - (১$\frac{১}{২}$) বোঝাতে একটি নির্দিষ্ট নামের ভগ্নাংশিক সংখ্যাশব্দ। দেড়দিন, দেড়হাতি।

আড়াই - (২$\frac{১}{২}$) বোঝাতে একটি স্বতন্ত্র নামের সংখ্যাশব্দ। আড়াই গজ, আড়াই মন।

পোওয়া/ পোয়া - ($\frac{১}{৪}$) অর্থাৎ চারভাগের একভাগ বোঝায়। পোয়াটাক দুধ, দু-পোয়া ঘি।

সিকে/সিকি - ($\frac{১}{৪}$) এই শব্দটিও চারভাগের একভাগ বোঝায়। সিকি বলতে ২৫ পয়সার মুদ্রাও ছিল, যা এক টাকার চারভাগের একাংশ । ২৫% বোঝাতেও ব্যবহার হয়। পাঁচসিকের সিন্নি মানত করা, অর্থাৎ একটাকা পঁচিশ পয়সার পুজো।

পৌনে - ($\frac{১}{৪}$) ভাগ কম বা বাকি বোঝায়। পৌনে তিনটে : তিনটে বাজতে ১৫ মিনিট ($\frac{৬০}{৪}$) বাকি।

সওয়া - ($\frac{১}{৪}$) ভাগ বেশি বা অতিরিক্ত বোঝায়। সওয়া তিনটে : তিনটে বেজে ১৫ মিনিট ($\frac{৬০}{৪}$) বেশি।

ছটাক - এক পোয়া-র চারভাগের একভাগ। এক ছটাক তেল।

এমনিতে অন্যান্য ভগ্নাংশসূচক সংখ্যাশব্দগুলির ক্ষেত্রে একের তিন, আটের পাঁচ, ছয়ের আট — এইভাবে দুটি সংখ্যার সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়। তার আগে পূর্ণসংখ্যা বসলে দুই পূর্ণ পাঁচের ছয় (২ $\frac{৫}{৬}$) বা সাত পূর্ণ চারের নয় (৭ $\frac{৪}{৯}$) — এভাবে উল্লেখ করা হয়।

(৩) গুণিতক সংখ্যাশব্দ :

- সংখ্যাশব্দটির শেষে - গুণ শব্দটি জুড়ে তার গুণিতককে চিহ্নিত করা হয়।
  দ্বিগুণ মজা, সাতগুণ আনন্দ, দশগুণ ভারী।
- এক্ষেত্রে অনেকসময় ইংরেজি ডবল শব্দটিও ব্যবহৃত হয়।
  ডবল খুশি, চার ডবল দাম, তিন ডবল পয়সা।
- দশ, কুড়ি সংখ্যাগুলিও অনেকক্ষেত্রে গুণিতকরূপে ব্যবহৃত হয়।
  চারকুড়ি বয়স হয়ে গেল, তিন দশ পাঁচ পঁয়তিরিশ, এক কুড়ি পান দাও।
- একই সংখ্যার দুবার উল্লেখে পরিমাণের অল্পতা বোঝায় এমন দৃষ্টান্ত পাই।
  দুটি-দুটি, চারটি-চারটি।

(৪) অনির্দেশক সংখ্যাশব্দ :

- দুটি সংখ্যাশব্দ পাশাপাশি বসিয়ে প্রয়োগ করলে নির্দিষ্ট সংখ্যা না বুঝিয়ে তা অনির্দিষ্ট বা মোটামুটি আন্দাজ কোনো সংখ্যা বোঝায়।

সাত-পাঁচ ভাবনা, দশ-বারো ফুট গভীর, সাত-আট হাজার মানুষ, আঠারো-উনিশ বছর বয়স।

- আবার সংখ্যাশব্দের সঙ্গে অন্য শব্দও বসে সেটিকে অনির্দিষ্ট করতে পারে।

পাঁচখানা নির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝালেও **খানপাঁচেক** অনির্দিষ্ট। একইভাবে **বারো বছর** কিন্তু **বছর বারো**। **দশ হাত** কিন্তু **হাতদশেক**। **বিঘে দুই, ফুটচারেক, মাইলখানেক, গোটাচারেক, জনা-তিরিশ**।

বাংলা বাগ্‌ধারায় অর্থাৎ লোকমুখে প্রচলিত বিশিষ্ট অর্থবোধক কথাতেও সংখ্যাবাচক শব্দের প্রয়োগ অন্যধরনের অর্থ প্রকাশ করে। যেমন :

একাই একশো, দশের লাঠি একের বোঝা, দু-কান কাটা, দু-মুখো সাপ, দু-নৌকায় পা দেওয়া, এককে একুশ করা, এক ঢিলে দুই পাখি মারা, দু হাত এক করা, পাঁচ কান হওয়া, চোদ্দো চাকার রথ দেখানো, চিঁড়ের বাইশ সের, সাত পুরুষ, চোদ্দো গুষ্টি।

৩. পূরণবাচক শব্দ

সংখ্যাশব্দগুলি সবই ছিল এক-একটি নাম। এই জাতীয় সংখ্যাশব্দ থেকে যখন কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা ক্রম বোঝায়, অর্থাৎ সংখ্যাশব্দের একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তখন সেই শব্দগুলিকে পূরণবাচক শব্দ বলে।

এই জাতীয় শব্দগুলিকে **পূরণবাচক বিশেষণ**, **ক্রমবাচক বিশেষণ**, **সংখ্যাক্রমবাচক শব্দ** — এরকম নামেও অনেকে চেনেন।

- সংস্কৃত বা আর্যভাষা থেকে বাংলায় বিভিন্ন ক্রমবাচক শব্দের ব্যবহার হয়। তার মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ, ঊনবিংশ, বিংশ, একবিংশ, দ্বাবিংশ, ত্রয়োবিংশ, চতুর্বিংশ, পঞ্চবিংশ ইত্যাদি বিভিন্ন পূরণবাচক শব্দ। এর পরবর্তী শব্দগুলি বেশিরভাগই অপ্রচলিত হয়ে গেছে।
- বাংলা মাসে কিছু তিথি ও দিনগণনার সূত্রে এমন কয়েকটি সংস্কৃত পূরণবাচক শব্দের ব্যবহার চলে। বিশেষ করে দুর্গাপুজোর সময়

দেখো পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী --- এগুলো আমরা সবাই বলি। এছাড়া দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী --- এইসব তিথিনামও পূরণবাচক।

- আগে আমরা আর্যভাষা অথবা সংস্কৃত ভাষা থেকে রূপান্তরের ফলে বাংলায় তৈরি হওয়া যেসব তদ্ভব শব্দের কথা বলেছিলাম, সেরকম অনেকগুলি তদ্ভব পূরণবাচক শব্দ আছে।

এক থেকে চার পর্যন্ত ঘরের এরকম শব্দগুলি: পয়লা, দোসরা, তেসরা, চৌঠা।

পাঁচ থেকে আঠারোর পূরণবাচক শব্দ : এগুলির জন্যে সংখ্যাশব্দের শেষে -‘ই’ বা -‘ওই’ যোগ করে শব্দগুলি তৈরি করা হয়। পাঁচই, ছয়ই, সাতই, আটই, নয়ই, দশই, এগারোই, বারোই,

তেরোই, চোদ্দোই, পনেরোই, ষোলোই, সতেরোই, আঠারোই।

উনিশ থেকে একতিরিশের পূরণবাচক শব্দ : এগুলির জন্য সংখ্যাশব্দের শেষে 'এ' যোগ করা হয়। উনিশে, বিশে, একুশে, বাইশে, তেইশে, চব্বিশে, পঁচিশে, ছাব্বিশে, সাতাশে, আঠাশে, উনতিরিশে, তিরিশে, একতিরিশে।

খেয়াল করো যে ওপরের এই পূরণবাচকগুলি আমরা মাসের তারিখ বোঝাতেই ব্যবহার করি।

- সংখ্যাশব্দের শেষে 'তম' যোগ করে পূরণবাচক শব্দ তৈরি হয়। যেমন : **একাদশতম**, **পঞ্চাশত্তম**, **শততম**। এগুলি সাধারণত কোনো সংস্থা বা গোষ্ঠীর বর্ষপূর্তি বোঝাতে বা ব্যক্তির জন্মদিনের সেই নির্দিষ্ট বর্ষপূর্তি বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।

● পরিবারের একাধিক ভাইবোনের ক্ষেত্রে মেজো, সেজো, ন , রাঙা ইত্যাদি শব্দ বা দ্বিতীয় বোঝাতে দোজ (দোজবর) শব্দগুলি কিছু প্রচলিত পূরণবাচক শব্দ, যা সম্পর্ক বোঝায়।

● সংখ্যাশব্দের শেষে 'র' বা 'এর' যোগ করে সহজেই পূরণবাচক করতে আমরা অভ্যস্ত। যেমন : **পাঁচের** (পাঁচ + এর) ঘরের নামতা। বইটির **পনেরোর** (পনেরো + র) পাতায় গল্পটা দেখো।

● একইভাবে সংখ্যাশব্দের পরে কেউ কেউ ইংরেজির 'নম্বর' শব্দটাও যোগ করে পূরণবাচক বানায়। যেমন : ডানদিকে **দু-নম্বর** গলি। **এক নম্বরের** কিপটে লোক।

বইয়ের **দশ নম্বর** অধ্যায়। **দু-নম্বরি** বলতে অসৎ বোঝায়। **বারো নম্বর** রুলটানা খাতা।

এরমধ্যে আবার সংখ্যাশব্দের বদলে কখনও পূরণবাচকও জুড়ে দেওয়া হয় : **পয়লা নম্বরের** ধড়িবাজ।

- চল্লিশ থেকে **চালশে** (চোখের ছানি), **বাহাত্তুরে** (বৃদ্ধ বোঝাতে)জাতীয় কিছু প্রচলিত শব্দ আছে। **ষাটোর্ধ্ব**, **সত্তরোর্ধ্ব** জাতীয় শব্দগুলি ষাট, সত্তরের থেকে বেশি বোঝাতে প্রচলিত।

হা
তে
ক
ল
মে

১.নীচের শব্দগুলির দুটি করে অর্থ লেখার চেষ্টা করো :

পড়া, তিল, বর্ণ, বল, চিনি, মুকুর, জাতি, লক্ষ, বাঁক, কাল, নর

২.বাঁদিকের শব্দগুলির সঙেগ ডানদিকের শব্দগুলিকে মেলাও :

দাউ দাউ	হাসি
গুম গুম	বাজ পড়া
শোঁশোঁ	কাঁচের সার্শি
ফিস ফিস	আগুন
ভন ভন	কিল মারা

হাউ হাউ	কথা বলা
খিক খিক	মাছি
থপ থপ	বাতাস বওয়া
কড় কড়	পা ফেলে চলা
ঝন ঝন	কান্না

৩.তোমার নাম আর তোমার পাঁচজন বন্ধুর নামগুলিকে ধ্বনিতে ভেঙে কটি করে স্বর ও ব্যঞ্জন রয়েছে দেখাও।

৪.নীচের শব্দগুলির মধ্যে মৌলিক শব্দ আর যৌগিক শব্দগুলিকে দুভাগে ভাগ করে সাজাও :

পণ্ডশ্রম, ঝুলন্ত, করি, সফলতা, বই, মাছ, নীচতম, বিদ্যামন্দির, ছয়, দাদা, দেখি

৫.উপযুক্ত সংখ্যাবাচক ও পূরণবাচক শব্দ উল্লেখ করে শূন্যস্থান পূরণ করো :

৫.১ ____________ সমুদ্র ______________ নদী।

৫.২ হাতের ________ আঙুল সমান হয় না ।

৫.৩ সপ্তাহে ______________ দিন।

৫.৪ শ্রাবণ হলো বছরের ____________ মাস।

৫.৫ ষষ্ঠ শ্রেণিতে __________ স্থান পেয়েছে।

৫.৬ ___________________ ভাই চম্পা আর ______________ বোন পারুল।

৫.৭ অরুণ, বরুণ, কিরণমালা ______________ ভাইবোন।

৫.৮ ______________ শ্রেণির শেষে মাধ্যমিক পরীক্ষা।

৫.৯ ___________ পঞ্চাশের সঙ্গে এক যোগ করলে হয় ___________।

৫.১০ আমার বয়স এখন ___________ বছর, ___________ শ্রেণিতে পড়ি।

৬.নীচের বাক্যগুলিতে কী জাতীয় সংখ্যাবাচক বা পূরণবাচক শব্দ ব্যবহার হয়েছে তা লেখো :

৬.১ বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যে প্রেস থেকে দেড়শো বই নিয়ে এসো।

৬.২ রজত জয়ন্তী পালন করতে সাত মাথার মোড় থেকে ভোর পৌনে ছটায় প্রভাতফেরী বার হবে।

৬.৩ আড়াই কিলো ময়দায় দুপোয়া ঘি মেখে এক লিটার জল দিয়ে আধ ঘণ্টা রেখে

লেচি পাকিয়ে প্রয়োজন মতো দুটো চারটে করে লুচি ভাজুন যাতে জনা চল্লিশ লোক পেটপুরে খেতে পারে।

৬.৪ পয়লা বৈশাখ থেকে ষাটোর্ধ্ব মানুষেরা বছরে দুবার বিনাখরচে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করাতে পারবেন।

৬.৫ মেজোকাকার পঞ্চাশতম জন্মদিন তেরোই অক্টোবর পালিত হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

শব্দরূপ, বিভক্তি, অনুসর্গ ও উপসর্গ

১. শব্দরূপ

আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছিলাম শব্দগুলি অর্থযুক্ত কিছু ধ্বনি বা ধ্বনির সমষ্টি। আমরা কথা বলার সময় বা লেখার সময় বাক্য তৈরি করি। এই বাক্যগুলি তৈরি করতে আমাদের শব্দ জুড়ে জুড়ে ব্যবহার করতে হয়।

সুরঞ্জনা ভালো মেয়ে।

ওপরে একটা বাক্য তৈরি হয়েছে তিনটে শব্দ দিয়ে। 'মেয়ে', 'ভালো' বা 'সুরঞ্জনা' এগুলো সেই

বাক্যের তিনটে শব্দ। দেখে মনে হচ্ছে শব্দগুলো জুড়ে দিলেই বাক্য হয়ে গেল। কিন্তু এভাবে সব বাক্য তৈরি করা যাবে না। যেমন,

সুরঞ্জনার বইতে কবিতাগুলি বেশ ভালো।

এবারে তাহলে শুধু শব্দ জুড়ে বাক্য হচ্ছে না। সুরঞ্জনা(-র) বই (-তে) কবিতা (-গুলি) এইভাবে শব্দের শেষে -র /-তে/-গুলি এমন সব খণ্ড বা শব্দাংশ যোগ করতে হলো। তখন এই শব্দগুলি আর শুধুই শব্দ না থেকে একটু অন্য ধরনের শব্দ হলো। **বাক্যের মধ্যে যখন শব্দগুলি এভাবে একটু বদলে গিয়ে বসে, আবার কখনো কখনো না বদলেও বসে, তখন সেগুলিকে বলে পদ।**

যে শব্দগুলো বদলায়নি, যেমন 'বেশ' আর 'ভালো'—সেগুলিকে যদি কোনো অভিধানে দেখতাম তাহলে বলতাম **শব্দ**। কিন্তু বাক্যটার
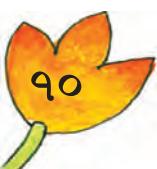
অংশ হিসেবে যখন দেখছি তখন সেগুলিরও নাম **পদ**। তার মানে কিছু পদ আছে যেগুলিকে দেখে মনে হচ্ছে শব্দই দেখছি। আর কিছু পদ আছে যেগুলিকে দেখে বুঝতে পারছি শব্দের সঙ্গে কিছু জুড়ে সেটা অন্যরকম হয়েছে। যে জিনিসগুলো শব্দের সঙ্গে জুড়েছে সেগুলির নাম হলো **বিভক্তি**। যে বিভক্তি জুড়লে শব্দের চেহারায় বা উচ্চারণে কোনো বদল হয় না, অথচ শব্দটা বাক্যে ব্যবহারের উপযুক্ত পদ হতে পারে, সেগুলিকে **শূন্য বিভক্তি** বলে। এগুলি অদৃশ্য, কিন্তু আছে। 'ভালো'/ 'বেশ' শব্দ দুটোর শেষে কিছু নেই যেমন বলতে পারি, আবার '০' শূন্য আছে এভাবেও বলতে পারি।

তাই বলা হয় :

(শব্দ) ভালো + ০ বিভক্তি = ভালো (পদ)

(শব্দ) বেশ + ০ বিভক্তি = বেশ (পদ)

শূন্য বিভক্তি জিনিসটা কেমন সহজ। বাক্যের মধ্যে যে কটা শব্দের শেষে কিছুই জোড়েনি সেগুলিই তাহলে শূন্য বিভক্তিওয়ালা পদ।

এবার দেখতে হবে যখন কিছু জুড়ছে, সেগুলি কীভাবে জোড়ে আর কী কী জোড়ে? বাক্যে পদগুলির ব্যবহার অনুযায়ী দুটো ধরন দেখা যায়। কিছু পদ কাজ বোঝায় আর বাকি পদগুলি নাম, সংখ্যা, সময়, গুণ বা বৈশিষ্ট্য বোঝায়। দু-ধরনের পদগুলি তৈরি হবার সময় দু-ধরনের বিভক্তির ব্যবহার হয়। কাজ বা ক্রিয়া বোঝায় এমন মূল বা সার শব্দরূপকে বলে **ধাতু** যেগুলি '√' চিহ্নের সাহায্যে আমরা আগের অধ্যায়ে বুঝেছি। (দেখে নাও 'সাধিত' শব্দের গঠন)। অন্য পদগুলির মূল বা সার হলো **শব্দ**।

- ধাতু-র সঙ্গে যে বিভক্তি যুক্ত হয় সেগুলিকে বলে **ধাতুবিভক্তি**। এভাবে ক্রিয়াপদ তৈরি হয়।

- শব্দ-র সঙ্গে যে বিভক্তি যুক্ত হয়, সেগুলিকে বলে **শব্দবিভক্তি**। এভাবে ক্রিয়া ছাড়া অন্য পদ তৈরি হয়।

এই অধ্যায়ে আমরা শব্দ-বিভক্তিগুলিকে চিনব। পরের অধ্যায়ে ধাতুবিভক্তি আর ক্রিয়াপদ।

২. শব্দরূপ ও শব্দবিভক্তি জুড়ে পদ গঠন

যেসব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি মূল শব্দরূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাক্যের অন্য পদগুলির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে সেই শব্দকে পদে রূপান্তরিত করে, সেগুলিই শব্দবিভক্তি।

এগুলির দ্বারা শব্দটির সংখ্যাগত পরিচয় (এক বা বহু), বাক্যে অবস্থিত পরবর্তী বা দূরবর্তী পদের সঙ্গে সম্পর্কও বোঝা যায়।

[কারক অনুযায়ী শব্দবিভক্তিগুলিকে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে আগে বাংলাতেও প্রথমা,

দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী—এইসব নাম দেওয়া হতো।]

শব্দবিভক্তিগুলি যখন একজন, একটি বস্তু বা প্রাণী, এরকম কিছু বোঝায়, সেরকম যে কটি রূপ আছে, সেগুলি হলো: -এ, -তে, -র, -কে, -রে, -এর, -য়, শূন্য বিভক্তি

গাছ + এ = গাছে, বাড়ি + তে = বাড়িতে, দাদা + র =দাদার, ভিখারি + কে = ভিখারিকে, পাখিটি + রে = পাখিটিরে, দল + এর = দলের, কলকাতা+ য় = কলকাতায়, তুমি + ০ = তুমি।

আমি, তুমি, সে, উনি, তিনি, তুই, আপনি—এই

শব্দগুলির সঙ্গে শব্দবিভক্তি জুড়লে দেখো মূল শব্দগুলিরও চেহারা কেমন বদলে যায়। যেমন:

আমি + র = আমার,

আমি + কে = আমাকে, আমি + য়= আমায়

তুমি + রে = তোমারে, তুমি + য় = তোমায়,

তুমি + কে = তোমাকে

সে + র= তার, সে + কে = তাকে,

সে + য় = তায়

উনি + কে= ওনাকে, উনি + র = ওনার,

উনি + রে = ওনারে

তিনি + র= তাঁর, তিনি + কে = তাঁকে,

তিনি + রে = তাঁরে

[তেনার, তেনাকে, তেনারও হয়]

তুই + র = তোর, তুই + কে = তোকে,

তুই + তে = তোতে

আপনি + র = আপনার,

আপনি + রে = আপনারে,

আপনি + কে = আপনাকে

একমাত্র ‘ও’ শব্দটি এভাবে বদলায় না বলে ওর, ওকে, ওতে, ওরে এই রূপগুলি পাওয়া যায়।

শব্দবিভক্তিগুলি একের বেশি ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী বা ভাব বোঝালে তার রূপ অন্যরকম হয়। সেগুলি হলো :

-রা, -এরা, -গুলি, -গুলো, -গণ, -দের, -দিগ

দেবতা + রা = দেবতারা,

মানুষ + এরা = মানুষেরা,

সন্দেশ + গুলি = সন্দেশগুলি,

হরিণ + গুলো = হরিণগুলো,

ব্রাহ্মণ + গণ = ব্রাহ্মণগণ,

বাবু + দের = বাবুদের,

বালিকা + দিগ = বালিকাদিগ

আমি, তুমি, সে জাতীয় শব্দগুলির ক্ষেত্রে আবারও আগেরবারের মতোই বদলানো রূপ দেখা যাবে। যেমন :

আমি + রা = আমরা

আমি + দের/দিগ = আমাদের /আমাদিগ

তুমি + রা = তোমরা

তুমি + দের/ দিগ = তোমাদের/তোমাদিগ

সে + রা = তারা

সে + দের / দিগ = তাদের / তাহাদিগ

ও + রা = ওরা

ও + দের / দিগ = ওদের / উহাদিগ

উনি + রা = ওনারা/ওঁরা

উনি + দের/ দিগ = ওনাদের / ওনাদিগ

তিনি + রা = তেনারা / তাঁরা

তিনি + দের/দিগ = তেনাদের / তাঁহাদিগ

তুই + রা = তোরা   তুই + দের = তোদের

আপনি + রা = আপনারা

আপনি + দের/দিগ = আপনাদের/আপনাদিগ

অনেক সময় দেখা যায় যে শব্দের সঙ্গে একটা শব্দবিভক্তি জোড়ার পরেও আরও একটা শব্দবিভক্তি না জুড়লে অর্থ পরিস্ফুট হচ্ছে না। তখন দ্বিতীয় বিভক্তিও জুড়তে হয়। যেমন :

বালকদিগকে ফুল দাও। (দিগ + কে)

মানুষগুলির মনে খুব আনন্দ। (গুলি + র)

গোরুগুলোর গলায় ঘণ্টা বাজাছে। (গুলো + র)

ফলগুলোতে পোকা লেগেছে। (গুলো + তে)

৩. অনুসর্গ

বাক্যে ব্যবহার করতে হলে শব্দগুলো শব্দবিভক্তি জুড়ে পদ হয়। তবুও অনেকসময় দেখা যায় যে বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে সেই শব্দবিভক্তি জোড়াটাও যথেষ্ট হচ্ছে না।

দুর্গামূর্তির **মুখের দিকে** ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

হাত দিয়ে দাবা খেল আর **পা দিয়ে ফুটবল**?

ওই **মেয়েটির কাছে,** সন্ধ্যাতারা আছে।

কেন চেয়ে আছ গো মা, **মুখপানে**?

খাবারের **দাম বাবদ** খুব বেশি দিতে হলো না।

এই কটা মাত্র **টাকা বই** তো নয়!

এই বাক্যগুলিতে দিকে, দিয়ে, কাছে, পানে, বাবদ, বই—এই যে শব্দগুলো বসেছে সেগুলোর সঙ্গে তার ঠিক আগের শব্দগুলোর প্রত্যক্ষ যোগ আছে।

এমনিতে আলাদা পদ হিসেবে এগুলোর গুরুত্ব নেই যদি না আগের শব্দবিভক্তিযুক্ত পদগুলির সঙ্গে এরা বসে। এরাও ঠিক সেই ধরনের কাজই করছে, শব্দবিভক্তিগুলি যেমন কাজ করত। এগুলিকেই **অনুসর্গ** বা শব্দের পরে বসে বলে **পরসর্গ** (ইংরেজিতে post position) বলে।

বিভক্তি আর অনুসর্গ দুটোই সম্পর্কযুক্ত শব্দ বা পদের পরে বসে; দুইয়ের কাজও অনেকটা একই রকম। কিন্তু বিভক্তি হলো ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ জাতীয় শব্দখণ্ড, আর অনুসর্গ হলো সম্পূর্ণ এক একটি শব্দ।
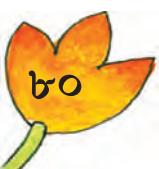
আগের শব্দবিভক্তি নিয়ে আলোচনায় আমরা দেখেছিলাম যে, বাংলায় শব্দবিভক্তির সংখ্যা খুব বেশি নয়। **তাই বিভক্তিযুক্ত পদের পরে বা বিভক্তির বদলে সম্পর্কযুক্ত পদটির পরে যে শব্দগুলি বসে বিভক্তিরই মতো কাজ করে**

(অর্থাৎ অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে) সেগুলিকে অনুসর্গ বলে। অনু (পশ্চাৎ) সর্গ নাম থেকেই বোঝা যায় এগুলি পরে বসবে।

- অনুসর্গের আরো কয়েকটি প্রচলিত নাম আছে: **পরসর্গ, সম্বন্ধীয়, কর্মপ্রবচনীয়**।
- বৈয়াকরণ অনুসর্গগুলিকে অব্যয় জাতীয় পদ বলতে চেয়েছেন। কারণ তাঁদের মতে অনুসর্গ শব্দগুলির যে চেহারা বা রূপ, তার সঙ্গে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ জুড়তে পারে না। তাই অনুসর্গগুলির রূপ অটুট থাকে। কিন্তু দেখো : মানুষের **সঙ্গেই** মানুষের বিবাদ হয়। উহাদের **সহিতই মিশিবে না।**

নদীর **পাশেই** ঘনবসতি। কিছুক্ষণের **মধ্যেই** অনুষ্ঠান শুরু হবে।

তোমার ভুলের **জন্যই** সর্বনাশটা হলো। মনের **ভিতরে** কী আছে কে জানে?

তাহলে সঙ্গে, পাশে, মধ্যে এরকম অনুসর্গগুলির পরেও কিন্তু শব্দবিভক্তি লাগানো যাচ্ছে।
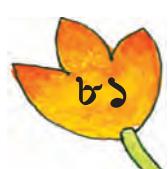
● বিভক্তিগুলির যেমন দুটো ভাগ : **শব্দবিভক্তি ও ধাতুবিভক্তি**

অনুসর্গগুলিরও তেমন দুটো রূপ : **শব্দজাত অনুসর্গ** ও **ধাতুজাত অনুসর্গ**

এই অধ্যায়ে আমরা শব্দজাত অনুসর্গগুলোকে কেবল চিনব। পরের অধ্যায়ে রইল ধাতুজাত অনুসর্গ।

৩.১ শব্দজাত অনুসর্গ

শব্দজাত অনুসর্গগুলিকে কেউ **নাম অনুসর্গ** বা কেউ **বিশেষ্য অনুসর্গ**ও বলে থাকেন। বাংলায় এই অনুসর্গগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

(১) সংস্কৃত বা তৎসম অনুসর্গ

(২) বিবর্তিত, রূপান্তরিত বা তদ্ভব অনুসর্গ
(+ দেশি অনুসর্গ)

(৩) বিদেশি অনুসর্গ

(১) সংস্কৃত বা তৎসম অনুসর্গ

এই অনুসর্গগুলি সংস্কৃত ভাষা থেকে পাওয়া। এর মধ্যে কতগুলি কেবল বাংলা সাধুভাষাতেই ব্যবহার হয়, চলিত বাংলা ভাষায় এগুলির ব্যবহার নেই।

১. **দ্বারা** : তোমার **দ্বারা** কিছুই হবে না।

২. **কর্তৃক** : বঙ্কিমচন্দ্র **কর্তৃক** এইসব শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছিল।

৩. **ব্যতীত** : জল **ব্যতীত** মাছের জীবন অসম্ভব।

৪. **দিকে** : ঘড়ির **দিকে** তাকিয়ে বসে আছি।

৫. **ন্যায়** : গোপাল ভাঁড়ের **ন্যায়** রসিক কটি আছে?

৬. **নিমিত্ত** : বিশ্রামের **নিমিত্ত** এই কক্ষটি নির্মিত।

৭. **পশ্চাতে** : মরীচিকার **পশ্চাতে** ছুটলে মৃত্যুই পরিণতি।

৮. **সমীপ** : প্রহরী রাজার **সমীপে** চোরটিকে পেশ করল।

৯. **অভিমুখে** : নদীগুলি যায় সাগরের **অভিমুখে**।

১০. **মধ্যে** : বাংলায় দশের **মধ্যে** দশ পেয়েছে।

এগুলি ছাড়াও এই শাখাটিতে অন্য অনুসর্গগুলি হলো : **অপেক্ষা, উপরে, কারণে, জন্য, নিকট,**

প্রতি, সঙ্গে, সম্মুখে, সহিত, নীচে, অন্তরে, অবধি।

(২) বিবর্তিত, রূপান্তরিত বা তদ্ভব অনুসর্গ এবং দেশি অনুসর্গ

তদ্ভব শব্দের মতো এই অনুসর্গগুলি সংস্কৃত থেকে রূপান্তরিত বা বিবর্তিত হয়ে তৈরি হয়েছে।

১. **বিনা** : শিক্ষা **বিনা** গতি নাই।

২. **তরে** : কীসের **তরে** এত আক্ষেপ?

৩. **মাঝে** : এ কলকাতার **মাঝে** আরেকটা কলকাতা আছে।

৪. **সঙ্গে** : ফুলটির **সঙ্গে** ভ্রমরের বন্ধুত্ব।

৫. **ছাড়া** : এই বৃষ্টিতে ছাতা **ছাড়া** বার হওয়া অসম্ভব।

৬. **আগে** : সবার **আগে** প্রয়োজন দেশের উন্নতি।

৭. **পাশে** : গরিবদের **পাশে** না দাঁড়ালে মানুষই নও।

৮. **কাছে** : তোমার **কাছে** যে কলম আছে, আমার **কাছেও** সে কলমই আছে।

৯. **সুদ্ধ** : বাচ্চাগুলোর উৎসাহ বড়োদের **সুদ্ধ** মাতিয়ে তুলেছে।

১০. **বই** : মানুষটা ঢের পড়াশোনা করে **বই** কি।

এই দশটি ছাড়াও এই ধারার অন্য অনুসর্গগুলি হলো : **সামনে, ভিতর, আশে, পানে। এর মধ্যে তরে, সাথে, মাঝে, পানে**—এই অনুসর্গগুলি শুধু কবিতাতেই ব্যবহার করা হয়।

(৩) বিদেশি অনুসর্গ

এই অনুসর্গগুলির মধ্যে প্রথম চারটি ফারসি ভাষা থেকে এবং পরের দুটি আরবি ভাষা থেকে বাংলায় গ্রহণ করা হয়েছে।
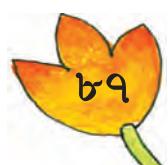
১. **বরাবর** : এই সোজা রাস্তায় নাক **বরাবর** চললেই পৌঁছে যাবে।

২. **বনাম** : মোহনবাগান **বনাম** ইস্টবেঙ্গলের খেলায় বরাবরই প্রচুর দর্শক হয়।

৩. **দরুন** : ঠান্ডার **দরুন** অবস্থা বেশ করুণ!

৪. **বাদে** : আর কিছুক্ষণ **বাদে** নাটকটা শুরু হবে।

৫. **বাবদ** : সামান্য এই কটা জিনিসের দাম **বাবদ** এতগুলি টাকা গচ্চা গেল!

৬. **বদলে** : নাকের **বদলে** নরুন পেলাম, টাক ডুমাডুমডুম!

৪. উপসর্গ

আগের অধ্যায়ে আমরা শব্দের সঙ্গে শব্দাংশ আর ধাতুর সঙ্গে শব্দাংশ জুড়ে কেমনভাবে সাধিত শব্দগুলি তৈরি হয় তার গঠন সম্বন্ধে জেনে গেছি। এই অধ্যায়ে দেখলাম তারও পরে জোড়া হচ্ছে বিভক্তি এবং সেটাও যথেষ্ট না হলে তারপর জুড়েছি অনুসর্গগুলি। সুতরাং এগুলি সবই ছিল শব্দের ডানদিকে অর্থাৎ শব্দের পরে কিছু না কিছু শব্দখণ্ড বা গোটা গোটা শব্দ যোগ করা। এবার ভাবব উলটোটা। তার মানে, শব্দের বাঁদিকে অর্থাৎ শব্দের আগে কিছু জোড়া হচ্ছে কিনা।

প্রথমে কয়েকটা এমন শব্দ নেওয়া যাক যেগুলি কীভাবে গঠিত হয় তা আমরা এর মধ্যে জেনে গেছি। এরকম কয়েকটা শব্দ হলো: বেলা, বৃষ্টি, ডাল, নজর, ছাগল, পেট।

এবার এগুলির প্রত্যেকটির বাঁদিকে একটা করে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ যোগ করে দেখব।

(অ) বেলা = অবেলা

(অনা) বৃষ্টি = অনাবৃষ্টি

(আব) ডাল = আবডাল,

(মগ) ডাল = মগডাল

(কু) নজর = কুনজর

(রাম) ছাগল = রামছাগল

(ভর) পেট = ভরপেট

এই বাঁদিকে অর্থাৎ শব্দের আগে যুক্ত (অ-, অনা-, আব-, কু-, রাম-, ভর-) অংশগুলিকে বা শব্দখণ্ডগুলিকে বলা হয় উপসর্গ। ইংরেজি ভাষায় Prefix কথাটা যেমন বোঝায় আগে সংযুক্ত উপাদান, বাংলায় উপসর্গও ঠিক তাই। শব্দগুলি যা ছিল, আর উপসর্গ লাগানোর পর যা হয়েছে, তাতে করে দেখো অনেকক্ষেত্রে অর্থও বদলে গেছে।

তাহলে উপসর্গ হলো সেইসব বর্ণ বা বর্ণচিহ্ন যেগুলি শব্দের আগে সংযুক্ত হয়ে শব্দটির অর্থকে আংশিকভাবে বা পুরোপুরি বদলে দিয়ে থাকে। উপসর্গগুলিকে অন্য নামে ডাকা হয়। সেই নামটি হলো আদ্যপ্রত্যয়। উপসর্গগুলি শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ তৈরি করে, কখনো শব্দের নির্দিষ্ট অর্থের ব্যাপ্তিও বোঝায়, আবার কখনো শব্দের অর্থকে সংকুচিতও করে। একটিই উপসর্গ অনেকরকম অর্থের তাৎপর্যও বোঝায়।

বাংলায় উপসর্গগুলিরও কয়েকটি শ্রেণি রয়েছে।

(১) বাংলার নিজস্ব উপসর্গ

(২) সংস্কৃত থেকে গৃহীত উপসর্গ

(৩) বিদেশি উপসর্গ

এবারে এই উপসর্গগুলিকে চিনে নেব। প্রত্যেকটার উদাহরণ আর অর্থেরও উল্লেখ করব।

৪.১ বাংলা উপসর্গ

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
অ -	অনড়, অমিল, অকেজো, অবেলা, অধর্ম, অকর্মা, অকথ্য	না-সূচক, খারাপ
অজ -	অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ	নিতান্ত
অনা -	অনাহার, অনাবৃষ্টি, অনাচার, অনাসৃষ্টি, অনামুখো	না-সূচক, মন্দতা
* আ -	আছোলা, আচমকা, আগাছা, আঘাটা, আকাল, আকথা, আলুনি	না-সূচক, অপকর্ষতা

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
আড় -	আড়চোখ, আড়মোড়া	বাঁকা, অর্ধেক
আন -	আনকোরা, আনমনা, আনচান	না-সূচক, বিক্ষিপ্ত
আব -	আবছায়া, আবডাল	অস্পষ্টতা
কু -	কুকথা, কুকাজ, কুনজর, কুলক্ষণ, কুডাক, কুচক্র	খারাপ
* নি -	নিপাট, নিখরচা, নিখাদ	না-সূচক
না -	নাহোক, নাবালিকা, নামঞ্জুর	না-সূচক

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
স -	সজোর, সপাট, সটান, সখেদ	সঙেগ
ভর -	ভরসন্ধে, ভরপেট, ভরদুপুর	পূর্ণতা
পাতি -	পাতিহাঁস, পাতিকাক, পাতিলেবু, পাতকুয়ো, পাতিপুকুর	ছোটো
রাম -	রামদা, রামগবেট, রামছাগল	বড়ো
গণ্ড -	গণ্ডগ্রাম	বড়ো
হা -	হাভাতে, হাপিত্যেশ, হাঘরে, হাপুস	অভাব

৪.২ সংস্কৃত থেকে গৃহীত উপসর্গ

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
প্র -	প্রদান, প্রসাদ, প্রশংসা, প্রচার, প্রবল, প্রলাপ, প্রবর্তন, প্রদোষ, প্রতারণা, প্রয়াণ	উৎকর্ষ, আধিক্য
পরা -	পরাজয়, পরাভব, পরাকাষ্ঠা, পরামর্শ, পরায়ণ, পরাক্রান্ত	বৈপরীত্য, আতিশয্য
অপ -	অপকর্ম, অপকৃষ্ট, অপহরণ, অপসারণ, অপদেবতা, অপসংস্কৃতি, অপমান, অপচয়	বৈপরীত্য, নিন্দা

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
সম্ -	সমর্থন, সম্পূর্ণ, সম্মান, সন্তর্পণ, সম্মিলন, সংযোগ, সংবাদ, সংকলন, সম্প্রীতি, সম্মুখ	সন্নিবেশ, সম্যক, আতিশয্য
* নি -	নিবিষ্ট, নিয়োগ, নিগূঢ়, নিক্ষেপ, নিদান, নিদারুণ, নিকৃষ্ট, নিগ্রহ, নিপাত, নিবারণ	সম্যক, আতিশয্য, নিন্দা
অব -	অবনতি, অবক্ষয়, অবজ্ঞা, অবমাননা, অবস্থান, অবরোধ, অবকাশ, অবসর	অধোগামিতা, বিরতি, মন্দভাব

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
অনু -	অনুসরণ, অনুকরণ, অনুশীলন, অনুকূল, অনুতাপ অনুদান, অনুপ্রবেশ, অনুকম্পা, অনুদিন, অনুক্ষণ	পরে, পৌনপুনিকতা, অভিমুখী
নির্ -	নির্দোষ, নির্লোভ, নির্বোধ, নিঃস্বার্থ, নিশ্চয়, নির্ণয়, নির্গমন, নিঃসরণ	অভাব, নিশ্চয়, বহির্মুখিতা
দুর্ -	দুর্ভিক্ষ, দুষ্প্রাপ্য, দুর্ভাগ্য, দুশ্চিন্তা, দুর্গম, দুরূহ, দুর্মূল্য, দুঃসময়	অভাব, মন্দ, ক্লেশ

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
বি -	বিপদ, বিপক্ষ, বিকৃতি, ব্যারাম, বিজয়, বিজ্ঞান, বিতৃষ্ণা, বিস্তার, বিখ্যাত	বৈপরীত্য, সম্যক, অভাব
অধি -	অধীশ্বর, অধিপতি, অধিকার, অধিবাসী	প্রাধান্য, ব্যাপ্তি
সু -	সুসিদ্ধ, সুতীব্র, সুসংবাদ, সুগম, সুলভ, সুতীক্ষ্ণ, সুদূর	ভালো, সহজ, আতিশয্যআতিশয্য

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
উৎ -	উন্নতি, উদ্‌বোধন, উত্তোলন, উৎকৃষ্ট, উচ্ছেদ, উৎপীড়ন, উচ্চারণ, উৎপাদন, উদ্ভিদ	উপরের দিক, আতিশয্য
পরি -	পরিপূর্ণ, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, পরিতাপ, পরিক্রমা, পরিবৃত, পরিভ্রমণ, পরিত্যাগ	চতুর্দিক, সম্পূর্ণতা
প্রতি -	প্রতিধ্বনি, প্রতিহিংসা, প্রতিক্রিয়া, প্রতিবেশী, প্রতিষ্ঠা, প্রতিকৃতি, প্রতিকূল, প্রতিবিম্ব, প্রতিমা, প্রতিকার, প্রতিপক্ষ	বৈপরীত্য, সাদৃশ্য

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
অভি -	অভিমান, অভিসার, অভিমুখ, অভিষেক, অভিনন্দন, অভিনিবেশ, অভিযান	সম্যক, সম্মুখ
অতি -	অতিরঞ্জন, অতিলৌকিক, অতিপ্রাকৃত, অত্যুক্তি, অত্যাচার, অত্যধিক, অতিরিক্ত	আতিশয্য
অপি -	অপিব, অপিনিহিতি	অতিরিক্ত

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
উপ -	উপকার, উপহার, উপশম, উপভোগ, উপকথা, উপভাষা, উপগ্রহ, উপনদী, উপকূল, উপকণ্ঠ	সামীপ্য, অপ্রধান
* আ -	আনত, আনম্র, আভাস, আবেগ, আকাঙক্ষা, আগমন, আজীবন, আমরণ, আবাসন, আকীর্ণ, আসমুদ্রহিমাচল, আপাদমস্তক, আবালবৃদ্ধবনিতা	পর্যন্ত, সম্যক, ব্যাপ্তি

৪.৩ বিদেশি উপসর্গ (ফারসি, আরবি ও ইংরেজি)

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
খোশ - (কা)	খোশমেজাজ, খোশখবর, খোশগল্প	আনন্দদায়ক
কার - (ফা)	কারখানা, কারচুপি, কারবার, কারসাজি	কাজ
দর - (ফা)	দরদালান, দরকচা, দরপাট্টা, দরপত্তনি	নিম্নস্থ
না - (ফা)	নারাজ, নাচার, নাপাক, নালায়েক	নয়
ফি - (ফা)	ফিহপ্তা, ফিবছর, ফিরোজ	প্রত্যেক
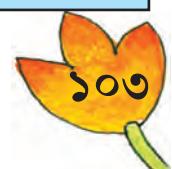
উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
ব - (ফা)	বমাল, বকলম	সঙ্গে
বে - (ফা)	বেওয়ারিশ, বেহুঁশ, বেআদব, বেমক্কা, বেচাল, বেআক্কেল, বেবাক, বেঘোর, বেপাত্তা	নিন্দাসূচক, ভিন্ন
বদ - (ফা)	বদরাগি, বদনাম, বদখেয়াল, বদমেজাজ, বদতমিজ, বদমাইশ, বদহজম	খারাপ, উগ্র
নিম - (ফা)	নিমরাজি	অর্ধেক

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
হর - (ফা)	হরদিন, হররোজ, হরবোলা, হরবখত, হরকিসিম, হরেকরকম	প্রত্যেক
আম - (আ)	আমজনতা, আমদরবার, আমসড়ক	সার্বজনীন, নির্বিশেষ
খাস - (আ)	খাসজমি, খাসকামরা, খাসদখল, খাসমহল, খাসখবর	ব্যক্তিগত, বিশেষ
গর - (আ)	গরহাজির, গররাজি, গরঠিকানা, গরমিল	নয়

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
লা - (আ)	লাপাত্তা, লাখেরাজ	নয়
ফুল - (ইং)	ফুলবাবু, ফুলপ্যান্ট, ফুলহাতা	পুরো
হাফ - (ইং)	হাফটিকিট, হাফহাতা, হাফনেতা, হাফমোজা, হাফআখড়াই, হাফথালা	অর্ধেক
হেড - (ইং)	হেডআপিস, হেড মিস্ত্রি, হেডপণ্ডিত, হেডস্যার, হেড দিদিমণি	প্রধান

* নি-আর * আ-এই দুটো উপসর্গ বাংলা উপসর্গের সঙ্গে সংস্কৃত থেকে নেওয়া উপসর্গের দুটি তালিকাতেই আছে। সেখানে সংস্কৃত তালিকার শব্দগুলো পুরোনো বা তৎসম; কিন্তু বাংলা তালিকার শব্দগুলো তদ্ভব বা দেশজ শব্দ।

একই উপসর্গের পরে শব্দ বসিয়ে আমরা দেখলাম যে, বাংলায় এরকম কত শব্দ তৈরি হয়েছে। এবার একটা উলটো পরীক্ষা করো। একই শব্দের আগে নানারকম উপসর্গ বসিয়ে দেখো, কত বিভিন্ন অর্থের শব্দ তৈরি হচ্ছে। যেমন —

- আহার, বিহার, প্রহার, পরিহার, উপহার, অনাহার।
- প্রকৃতি, আকৃতি, বিকৃতি, সুকৃতি, নিষ্কৃতি, অনুকৃতি, দুষ্কৃতি, প্রতিকৃতি

- আগত, প্রগত, বিগত, পরাগত, সংগত, নির্গত, অবগত, অনুগত, দুর্গত, অধিগত
- বিনত, প্রণত, পরিণত, অবনত, আনত
- আবাদ, প্রবাদ, অপবাদ, সংবাদ, অনুবাদ, বিবাদ, সুবাদ, পরিবাদ, প্রতিবাদ

আগের শব্দগুলির প্রায় সবই সংস্কৃত উপসর্গ সংযুক্ত করেই তৈরি হয়েছে। বাংলা বা বিদেশি উপসর্গ দিয়ে এত বেশি শব্দরূপ পাওয়া সম্ভব নয়।

সবশেষে আমরা সবকটি বিভাগ থেকেই কিছু কিছু উপসর্গযুক্ত শব্দ বাক্যে কেমনভাবে প্রয়োগ করা হয় তা দেখব।

অ : **অকেজো** লোকগুলি এক একটা **অকর্মার** ঢেঁকি !

আড় : দুজনেই **আড়চোখে** দুজনকে দেখছে আর **আড়মোড়া** ভাঙছে, তবু বিছানা ছাড়ছে না।

ভর : সারাদিন কিছু না খেয়ে এখন **ভরসন্ধ্যায়** এমনভাবে কেউ **ভরপেট** খায়!

পাতি : **পাতিপুকুরের** ঘোলা জল থেকে **পাতিহাঁস**গুলি মাছ ধরে খাচ্ছে।

হা : বন্যায় সব ভেসে গিয়ে **হাঘরে** লোকটি **হাভাতের** মতো একটু খাবারের আশায় **হাপিত্যেশ** করে বসে আছে।

অবেলায় লোকগুলি **পাতকুয়োর** জল খেয়ে **রামদা** নিয়ে **আগাছা** কেটে **ভরপেট** খাবার খাবে।

উপরের বাক্যটায় দেখো : পাঁচটা বাংলা উপসর্গজাত শব্দ একই বাক্যে ব্যবহার হয়েছে। তার আগের পাঁচটা উপসর্গও বাংলার নিজস্ব

উপসর্গ। এবার দেখব সংস্কৃত উপসর্গের দ্বারা তৈরি বাংলা শব্দের বাক্যে প্রয়োগ।

পরা : ওনার **পরামর্শ** অনুযায়ী খেললে **পরাজয়** অনিবার্য।

অপ : এতগুলো টাকা বছর বছর **অপসংস্কৃতির** পিছনে **অপব্যয়** করছ?

অনু : কেবলই **অনুকরণ** করে চললে একদিন **অনুতাপ** করতে হবে।

দুর : **দুর্ভিক্ষের** দিনগুলিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস **দুর্মূল্য** হবার পরও **দুষ্প্রাপ্য** ছিল।

উপ : **উপকার** করলে কি কেউ **উপহার** প্রত্যাশা করে?

আসমুদ্রহিমাচল যার **অধিকারে** ছিল তিনি দেশের **উন্নতির** জন্য **সম্প্রীতির** বার্তা **প্রতিবেশী**_দেশগুলিতে ছড়িয়ে দিয়ে সবার **প্রশংসা** পেলেন।

এবারে সংস্কৃত উপসর্গযুক্ত ছটা শব্দ একই বাক্যে দেখা গেল। সবশেষে বিদেশি উপসর্গের পালা।

ফি : **ফি-বছর** ওরা শীতকালে পিকনিক করে; **ফি-হপ্তাতে** বেড়াতে যায়।

বদ: খাবার **বদহজম** হলে লোক কি **বদমেজাজি** হয়ে যায়?

গর : অনেক লোক **গরহাজির** থাকায় হিসেবে **গরমিল** হয়ে গেল।

বে : **বেআক্কেলে** ছেলেটা **বেহুঁশ** হয়ে ফুটপাথে ঘুমোচ্ছে।

হেড : **হেডআপিসের** বন্ধ পাখাটা সারাতে **হেডমিস্ত্রির** ডাক পড়ল।

বেওয়ারিশ বাড়ির বাসিন্দা যে ছেলেটা ভালো হরবোলার ডাক ডাকত, **খাসজমির** দখল নিয়ে দু-দলের মারামারির মাঝে পড়ে বেচারা **বেঘোরে** প্রাণ হারাল।
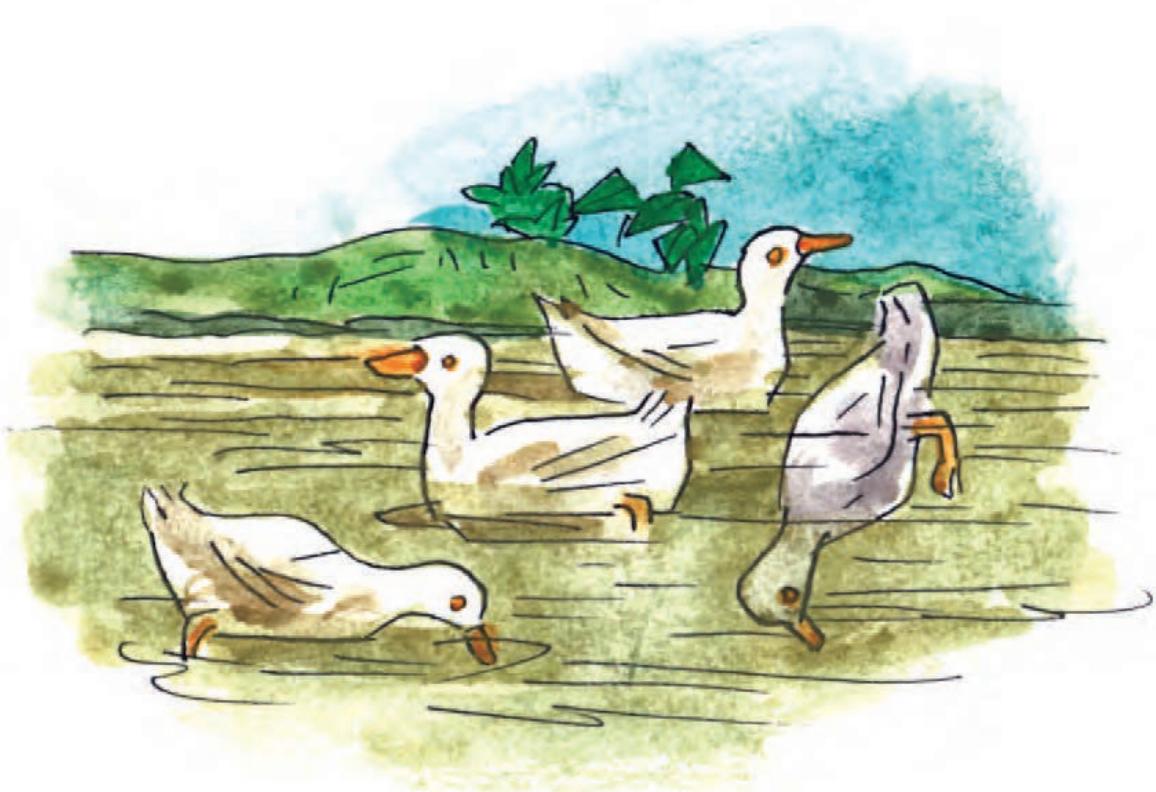
এই বাক্যে তাহলে চারটে বিদেশি উপসর্গযুক্ত শব্দ রয়েছে।

মোট যা শিখলাম এবার সবটাকে যদি জড়ো করে সাজাও, তাহলে এমন একটা জিনিস পাওয়া যাবে :

উপসর্গ	+ শব্দ	+ বিভক্তি	= পদ	+ অনুসর্গ
↓	↓	↓	↓	↓
প্রতি	যোগী	-র	= প্রতিযোগীর	দ্বারা

হা
তে
ক
ল
মে

১.নীচের শব্দগুলিকে পদে রূপান্তরিত করে অর্থপূর্ণ বাক্য বানাও :

১.১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মদিন বিদ্যালয় রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হয়।

১.২ আমি বাবা রোজ মাছ খাবার দেওয়া।

১.৩ বাড়ি লোক মাঠ চাষবাস করা।

১.৪ উনি তুমি নাম জানো চায়।

১.৫ দিদিমণি ক্লাস নেওয়া পর একটা গান শোনা।

২.নীচের বাক্যগুলি থেকে 'অ'-বিভক্তিযুক্ত ও অন্যান্য বিভক্তিযুক্ত পদ নির্দেশ করো :

২.১ অনেক রাত পর্যন্ত বই পড়ে ঘুমোতে যাই।

২.২ নদীগুলি সমুদ্রের কাছে এসে বেগ কম করে।

২.৩ প্রশ্নপত্র কঠিন বলে কারো আর কলম চলছে না।

২.৪ হানিফ মিয়া কাস্তে হাতে ধান কাটতে গেল।

২.৫ কলকাতায় দাদার বাড়িতে যাবে বলে মছলন্দপুর থেকে ট্রেন ধরল।

৩.নীচের এক একটি শব্দে বিভিন্ন শব্দবিভক্তি যুক্ত করে নতুন শব্দরূপ বানাও :

আমি, আপনি, তুই, সে, উনি, তুমি, ও, তিনি

৪.নীচের শব্দবিভক্তিগুলির প্রতিটির আগে তিনটি করে উপযুক্ত শব্দ জুড়ে পদ বানাও :

গুলো, দের, এরা, দিগ, গণ, রা, গুলি

৫.নীচের শব্দগুলি থেকে শব্দ ও শব্দবিভক্তি আলাদা করো :

সন্তানদিগেরা, পাখিগুলি, প্রাণকে, আপনাদেরকে, শিশুগুলির, কলতলাতে, সন্ধ্যাবেলায়, ভূতেদের, নৃত্যটি, মানুষদের, ভয়কে

৬.নীচের অনুসর্গগুলির আগে উপযুক্ত অর্থপূর্ণ শব্দ বসাও :

পানে, কাছে, বাবদ, দিয়ে, দিকে, মধ্যে, জন্যে, ভিতরে, সঙ্গে, পাশে, ব্যতীত, ন্যায়, সমীপে, অভিমুখে, দ্বারা, কর্তৃক, বিনা, তরে, মাঝে, ছাড়া, সাথে, আগে, সুদ্ধ, বই, বদলে, বাবদ, দরুন, বনাম, বরাবর

৭.উপযুক্ত অনুসর্গ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

৭.১ দৌড়ে সবার ______ প্রথম হলো।

৭.২ জুতো ______________________ খালিপায়ে যাবে কী করে?

৭.৩ বইগুলো ______________________ মোট তিনশো টাকা দিতে হলো।

৭.৪ সবাই সবার __________________ যেতে চায়।

৭.৫ প্রতিবছরের ________________ এবারেও মেলা বসেছে।

৭.৬ বাড়ি ফেরার সময় সকলের ____________ ভালো মিষ্টি এনো।

৭.৭ আহা ছেলেমানুষ _________________ তো নয়!

৭.৮ শিক্ষক ______________________ ছাত্রদের ক্রিকেট খেলা আছে।

৮ নীচের বাক্যগুলি থেকে বিভিন্ন শব্দের উপসর্গগুলিকে আলাদা করো :

৮.১ তিনি অনাহারে অনড় থাকায় স্বাস্থ্যের অত্যন্ত অবনতি হলো।

৮.২ কুকাজ করে বিপদে পড়ায় এখন সম্মান নিয়ে টানাটানি চলছে।

৮.৩ সুস্বাদু মাংস খেয়ে খোশমেজাজে বাড়িতেই অবস্থান করছেন।

৮.৪ বদহজম হলে হরেকরকম ওষুধ আছে, ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খেয়ো।

৮.৫ অত্যাচার করে, উৎপীড়ন করে নির্দোষ লোকগুলিকে বিপদে ফেলছ।

৯. তিনটি করে উপসর্গযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে আলাদা আলাদা পাঁচটি বাক্য বানাও ।

১০. নীচের শব্দগুলির আগে তিনটি করে উপসর্গ বসিয়ে আলাদা আলাদা শব্দ তৈরি করো :

নতি, চার, দেশ, পদ, কাশ

১১. বাংলা, সংস্কৃত ও বিদেশি উপসর্গযুক্ত মোট তিনটি করে শব্দ জুড়ে আলাদা আলাদা পাঁচটি অর্থপূর্ণ বাক্য বানাও।

চতুর্থ অধ্যায়

ধাতুরূপ

ধাতুবিভক্তি/ক্রিয়াবিভক্তি ও ক্রিয়া

১. ধাতুরূপ

তোমাদের এখন একটু দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটা অংশ একটু মনে করতে হবে। সেখানে এক জায়গায় আমরা দেখেছিলাম **ধাতুর সঙ্গে শব্দাংশ জুড়ে সাধিত শব্দ** কীভাবে তৈরি হয়।

যে শব্দগুলি দিয়ে আমরা কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝাই সেগুলির নাম **ক্রিয়া**। এটাও আমরা জেনে গেছি আগেই। এবার সেরকম

কয়েকটা শব্দ নিই যেগুলি কাজ বোঝাচ্ছে। যেমন দেখো :

চলা, বলা, দেখা, শোনা, করা, খাওয়া, চাওয়া, হওয়া

এই শব্দগুলিকে (ক্রিয়া শব্দ) আরো ছোটো অংশে ভাঙা যায়। কারণ এগুলি শব্দাংশ বা সহযোগী শব্দখণ্ড জুড়ে তৈরি হয়েছে। আর তার সঙ্গে মূল অংশ হিসেবে বা সার অংশ হিসেবে যেগুলি আছে, সেগুলিই হলো **ধাতু** বা **ধাতুরূপ**। ক্রিয়া শব্দগুলির একটা মানে রয়েছে। কিন্তু এগুলিকে ভেঙে আমরা পাব **ধাতু** আর **প্রত্যয়** জাতীয় শব্দাংশ। সে দুটোর কোনোটাই কিন্তু অর্থপূর্ণ শব্দ নয়। ধাতুরূপ লেখার আগে সেটাকে চেনাবার জন্য আমরা '**√**' চিহ্ন বসাই, এটাও আগে জেনে গেছি।

ক্রিয়া	ধাতু	সহযোগী শব্দখণ্ড
চলা	√ চল্	আ
বলা	√ বল্	আ
দেখা	√ দেখ্	আ
শোনা	√ শুন্	আ
করা	√ কর্	আ
খাওয়া	√ খা	আ (ওয়া হচ্ছে)
চাওয়া	√ চা	আ (ওয়া হচ্ছে)
হওয়া	√ হ	আ (ওয়া হচ্ছে)

√ চল্ + আ = চলা — এইভাবে তাহলে **ধাতুরূপ + সহযোগী শব্দখণ্ড = ক্রিয়া** তৈরি করছে।

‘আ’ নামের এই অংশটা ধাতুরূপের পরে শব্দাংশ হিসেবে জোড়ে বলে, এটাকে **ধাতুসহযোগী শব্দখণ্ড** বলে। কোনো কোনো ক্রিয়াশব্দে দেখ ‘আ’-টা উচ্চারণে ‘ওয়া’ হয়ে যাচ্ছে। যেমন :

√হ্ + আ = হআ/হয়া না হয়ে **হওয়া** হচ্ছে। আবার দেখো ক্রিয়া শব্দটাতে ধাতুরূপটারও উচ্চারণ বদলে যেতে পারে। যেমন : √বুঝ্ + আ = বুঝা না হয়ে বোঝা, √শুন্ + আ = শুনা না হয়ে শোনা ইত্যাদি।

এমন আরও কিছু সহযোগী শব্দাংশ রয়েছে যেগুলি ধাতুর পরে যুক্ত হয়ে ক্রিয়াশব্দ তৈরি করে না। শব্দগুলি অন্য ধরনের শব্দ হয়ে যায়। এরকম কয়েকটা হলো :

- অন	√ চল্ + অন = চলন, √ শী + অন = শয়ন নয়ন, গমন, বরণ, হরণ ইত্যাদি।
-মান	√ চল্ + মান = চলমান, √ বহ্ + মান = বহমান ধাবমান, দৃশ্যমান, বিদ্যমান ইত্যাদি।
-আই	√ সিল্ + আই = সেলাই, √ লড়্ + আই = লড়াই বাছাই, চড়াই, খাড়াই, খোদাই, যাচাই ইত্যাদি।
-অক	√ পঠ্ + অক = পাঠক, √ দৃশ্ + অক = দর্শক গায়ক, নায়ক, বাদক, নর্তক ইত্যাদি।
-ইয়ে	√ খা + ইয়ে = খাইয়ে, √ বল্ + ইয়ে = বলিয়ে করিয়ে, নাচিয়ে, গাইয়ে, বাজিয়ে ইত্যাদি।

এই উদাহরণগুলি মনে রাখব শুধু এইটুকু বুঝতে যে, ধাতুরূপ আর শব্দাংশ জুড়ে কেবল ক্রিয়াশব্দই তৈরি হয় না। অন্য ধরনের বিভিন্ন শব্দও তৈরি হয়। এর উলটো টাও হয়। অর্থাৎ ক্রিয়াশব্দ তৈরি করতে কেবল ধাতুরূপ লাগে এমনটাও নয়। এমন অনেক শব্দরূপ আছে যেগুলি থেকে তৈরি হওয়া শব্দ আমরা কোনো কাজ বোঝাতে ক্রিয়াশব্দ হিসেবেই ব্যবহার করে থাকি। যেমন :

(অবস্থা) ঘুম - ঘুমোবেন (ক্রিয়া)

(বস্তু) ধ্বনি - ধ্বনিল (ক্রিয়া)

(বস্তু) বিষ - বিষাইছে (ক্রিয়া)

(অবস্থা) কাতর - কাতরানি (ক্রিয়া)

(বৈশিষ্ট্য) রাঙা - রাঙানো (ক্রিয়া)

(ধ্বনি) খটখট - খটখটিয়ে (ক্রিয়া)

(ধ্বনি) ভ্যানভ্যান - ভ্যানভ্যানানি (ক্রিয়া)

(বৈশিষ্ট্য) পচা - পচানো, পচাচ্ছে (ক্রিয়া)

এবার আমরা আবার ফিরে যাই ওই -আ শব্দখণ্ড ধাতুর শেষে বসিয়ে তৈরি হওয়া ক্রিয়াশব্দগুলিতে। ওই ক্রিয়াশব্দগুলি ছিল : চলা, দেখা, হওয়া ইত্যাদি।

বাক্যে এগুলিকে আমরা ব্যবহার করি। তোমার সঙ্গে আবার **দেখা** হলো। এইভাবে **চলা** অসম্ভব। এবার একটু গান **হওয়া** উচিত।

প্রত্যয় বসিয়ে তৈরি এই ক্রিয়াশব্দগুলি শুধু কিছু মূল কাজ বোঝাচ্ছে। কিন্তু এগুলি দিয়ে সবসময় বাক্য তৈরি করা চলে না। অন্য কয়েকটা বাক্য দেখলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। যেমন ধরো :

আমি **দেখাব**।

ভদ্রলোক **দেখালেন**।

এমন জিনিস **দেখানো** অসম্ভব।

দেখাতে হলে ভালোটাই **দেখাও**।

√দেখ ধাতু থেকে যেমন শেষে -আ শব্দাংশ বসিয়ে একটা ক্রিয়াশব্দ 'দেখা' হয়েছিল, এবার সেই 'দেখা' শব্দটার পরেও আবার -ব, -লেন, -নো, -তে, -ও জাতীয় শব্দাংশ বসিয়ে আরো অনেকগুলি ক্রিয়াশব্দ তৈরি হয়ে গেল। তাহলে √দেখ্ শব্দাংশটা যেমন একটা মূল হিসেবে কাজ করছিল, তেমন এবার 'দেখা' ক্রিয়াশব্দটাও আরেকটা মূল হিসেবে কাজ করছে। সেখান থেকে একই উপায়ে অর্থাৎ পরে নতুন শব্দাংশ জুড়ে আরো অনেকগুলি ক্রিয়াশব্দ তৈরি করে ফেলতে পারছি। তাহলে 'দেখা'-টাকেও আমরা আরেক ধরনের মূল বলতে পারি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিখেছিলাম মৌলিক/সিদ্ধ শব্দ একরকম, আর সাধিত/যৌগিক শব্দ আরেকরকম। মৌলিক শব্দগুলিকে আর ভাঙা যায় না, কিন্তু সাধিত শব্দগুলিকে ভাঙা যায়। ক্রিয়াশব্দের যে মূলগুলি সবথেকে ছোটো, এবার থেকে সেগুলিকে বলব **মৌলিক ধাতু** বা **সিদ্ধ ধাতু**। সেগুলির সঙ্গে -আ প্রত্যয় জুড়ে যে ক্রিয়াশব্দগুলি তৈরি হলো সেগুলিকে বলব যৌগিক ধাতু বা সাধিত ধাতু। কারণ এই শব্দগুলোও কাজ করা বা হওয়া বোঝায়। আবার এই শব্দগুলি অন্য কতগুলি বড়ো ক্রিয়াশব্দের মূলরূপ হিসেবে কাজ করতে পারে বলে এগুলিকে ধাতু বলেই ধরা হয়। মৌলিক ধাতুর সঙ্গে যেমন শব্দাংশ যুক্ত হয়, তেমনি সাধিত ধাতুর সঙ্গে যে শব্দাংশ যুক্ত হয় সেগুলিকে বলে বিভক্তি। এই বিভক্তিগুলির নাম **ধাতুবিভক্তি**। এর

কথা আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে একটু জেনেছিলাম। এবার আরো ভালো করে জানব।

যতটা জানলাম তাকে এবার এইভাবে সাজিয়ে নিতে পারি :

সিদ্ধ ধাতু + শব্দাংশ = সাধিত ধাতু

সাধিত ধাতু + ধাতুবিভক্তি = ক্রিয়াপদ

উদাহরণ দেখে নিই :

সিদ্ধধাতু	শব্দাংশ	সাধিত ধাতু	ধাতুবিভক্তি	ক্রিয়া
√ ভাব্	-আ	ভাবা	-নো	ভাবানো
√ বস্	-আ	বসা	-নো	বসানো
√ কর্	-আ	করা	-লেন	করালেন
√ শেখ্	-আ	শেখা	-ন	শেখান
√ দে	-আ	দেওয়া	-ই	দেওয়াই
√ খা	-আ	খাওয়া	-য়	খাওয়ায়

এর পাশাপাশি মনে রাখব যে, মৌলিক/সিদ্ধ ধাতুর সঙ্গে শব্দাংশ না জুড়ে সরাসরি ধাতুবিভক্তি বা ক্রিয়াবিভক্তিগুলি জুড়েও ক্রিয়াপদ তৈরি হয়। যেমন :

√বল্ + ত = বলত; √কর্ + ই = করি;

√চল্ + ও = চলো; √দেখ্ + ই = দেখি,

√দে + য় = দেয় (দ্যায়); √খা + ন = খান;

√বুঝ্ + এ = বোঝে

ধাতুরূপ একটা কাজের মূল ধারণাটাকে বোঝায়। কিন্তু ক্রিয়াপদগুলিকে দেখলেই আমরা আরো কতগুলি জিনিস বুঝতে পারি। যেমন : কাজটা কেউ নিজে করছে না অন্যকে দিয়ে করাচ্ছে। কাজটা সে নিজের জন্য করছে না অন্যের জন্য করছে। কেবল কাজটার পরিচয়

দেওয়া হচ্ছে, নাকি কাজটা করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে বা কাজ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কাজটা আগেই হয়ে গেছে, নাকি এখন কাজটা চলছে, নাকি পরে কখনো কাজটা করা হবে। তাহলেই ভেবে দেখো ক্রিয়াপদের কতরকম বৈশিষ্ট্য হয়। সিদ্ধধাতু বা সাধিত ধাতুর সঙ্গে যে ক্রিয়াবিভক্তি/ ধাতুবিভক্তিগুলি জুড়ে যায় সেগুলির কাজই হচ্ছে ক্রিয়াপদের এই বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝিয়ে দেওয়া। কয়েকটা বাক্যের সাহায্যে এই ক্রিয়াপদের পার্থক্য বুঝে নিই :

১) আমি গান **শুনি**। ২) আমরা গান **শুনি**।	**শুনি**

'আমি' বা 'আমরা' দুবারই দেখো ক্রিয়াপদটা একই থাকছে — 'শুনি'। কিন্তু এটাই যখন 'তুমি',

‘তোমরা’, ‘সে’, ‘তারা’ শব্দগুলির সঙ্গে বসবে তখন অন্যরকম হয়ে যাবে।

৩)তুমি গান **শোনো**। ৪) তোমরা গান **শোনো**।	**শোনো**
৫) আপনি গান **শোনেন**। ৬) আপনারা গান **শোনেন**।	**শোনেন**
৭) তুই গান **শুনিস**। ৮) তোরা গান **শুনিস**।	**শুনিস**

তুমি বলে যেমন বলি, তেমনি গুরুজন হলে বা অচেনা লোক হলে তাকে আপনি বলি। সমবয়সি বা ছোটো হলে তুই বলে ডাকি। সেইভাবে [তুমি-তোমরা], [আপনি-আপনারা] আর [তুই-তোরা] — এগুলির প্রতিটি জোড়ার জন্য

একই রকম ক্রিয়াপদ বসে। এরকমই আরো কয়েকটির দৃষ্টান্ত হলো :

৯) ও/সে গান **শোনে**। ১০) ওরা/তারা গান **শোনে**। ১১) পরিমল গান **শোনে**। ১২) পরিমলরা গান **শোনে**।	**শোনে**
১৩) উনি/তিনি গান **শোনেন**। ১৪) ওরা/তারা/ওনারা/ তেনারা গান **শোনেন**।	**শোনেন**

১ আর ২ কে বলব **আমি পক্ষ**। ৩ থেকে ৮ কে বলব **তুমি পক্ষ**। ৯ থেকে ১৪ কে বলব **সে পক্ষ**। প্রত্যেক পক্ষেই একজন বোঝাচ্ছে এমন শব্দ আছে, আবার একের বেশি জন বোঝাচ্ছে এমন শব্দও আছে। নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যে, ৫-৬ আর ১৩-১৪ এই দুটো জোড়ার

মানুষগুলি আলাদা হলেও ক্রিয়াপদগুলি একই (শোনেন) থাকছে।

যে কোনো মানুষ বা মানুষদের যখন এই সব শব্দগুলি দিয়েই পরিচয় দিই বা চিনি, তখন একটাই ধাতু বা ক্রিয়াপদ নানা বিভক্তি জুড়ে নানারকম হয়ে যায়। এরকম মোট পাঁচটা রূপ পেলাম।

√ শুন্ + ই = শুনি	আমি পক্ষ
√ শুন্ + ও = শোনো	তুমি পক্ষ
√ শুন্ + ইস = শুনিস	তুমি পক্ষ
√ শুন্ + এ = শোনে	সে পক্ষ
√ শুন্ + এন = শোনেন	তুমি পক্ষ + সে পক্ষ

কাজটা/কাজগুলো কে বা কারা করছে সেই অনুযায়ী এখানে মৌলিক/সিদ্ধ ধাতু অথবা

যৌগিক সাধিত ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তি জুড়ে (ই, ও, এস, এ, এন) ক্রিয়াপদগুলি তৈরি হচ্ছে। এরপর আমরা অন্য আরেক ধরনের ক্রিয়াপদ চিনে নেব। একটা কাজ হলে বা করলে সময় অনুযায়ী তার তিনরকম পরিচয় থাকতে পারে। হয় কাজটা আগে করা হয়ে গেছে। না হলে কাজটা এখন করা হচ্ছে। অথবা কাজটা পরে করা হবে।

যেটা হয়ে গেছে সেটা **অতীত সময়/কাল**

যেটা এখন হচ্ছে সেটা **বর্তমান সময়/কাল**

যেটা পরে করা হবে সেটা **ভবিষ্যৎ সময়/কাল**

সে সব কাজ অতীত সময়ে করা হয়ে গেছে বা করা হচ্ছিল

করলেন, যাচ্ছিলাম, লিখছিলেন, যেতাম, পড়তেন, দেখাচ্ছিলেন, ভাবত

যে সব কাজ বর্তমান সময়ে করা হচ্ছে

গাইছে, বসেছেন, ওঠে, ঘোরে, পড়ছে, দেখেছে

যে সব কাজ ভবিষ্যৎ সময়ে করা হবে

বলবেন, যাবি, থাকবেন, এসে থাকবে, ভুলব

এবার তাহলে দেখলাম যে, কাজটা কখন করা হচ্ছে সেই অনুযায়ী এখানে মৌলিক অথবা সাধিত ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তি জুড়ে ক্রিয়াপদগুলি তৈরি হচ্ছে। আগের তালিকা আর এই তালিকা দুটো একসঙ্গে আসলে কাজ করা বোঝায়। এবারে তাই দুটোকে মিলিয়ে লিখব।

ব্যক্তি পক্ষ	অতীত কাল	বর্তমান কাল	ভবিষ্যৎ কাল
আমি - আমরা	বলেছিলাম,	বলছি, যাই যেতাম	বলব, যাব
তুমি - তোমরা	বলেছিলে, যেতে	বলছ, যাও	বলবে, যাবে *
তুই - তোরা	বলেছিলি, গিয়েছিলি	বলছিস, যা	বলবি, যাবি
ও / সে - ওরা / তারা সাকিলা-সাকিলারা	বলেছিল, যেত	বলছে, যাক	বলবে, যাবে *
উনি/তিনি-ওনারা/ তাঁরা আপনি-আপনারা	বলেছিলেন, যেতেন	বলছেন, যান	বলবেন, যাবেন

* চিহ্নিত অংশদুটোর মধ্যে মিল রয়েছে। তার মানে ‘তুমি’ পক্ষের আর ‘সে’ পক্ষের ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদগুলি একই রকম হয়।

ক্রিয়াপদগুলি বাক্যের মধ্যে কাজের পদ্ধতি বা গতিপ্রকৃতিকে নানারকম ভাবে বোঝায়। সেই অনুযায়ী কয়েক রকমের ক্রিয়াপদের পরিচয় এবার দেখে নেব।

১. **বাক্যের যে ক্রিয়াপদ সেই কাজটা সম্পূর্ণ হয়েছে এটা বোঝায় তার নাম সমাপিকা ক্রিয়া**। যেমন :

ট্রেনটা স্টেশনে **পৌঁছল**। আমরা পেটভরে **খেলাম**। বইগুলো গুছিয়ে **রাখল**।

২. **বাক্যের যে ক্রিয়াপদে কাজটা সম্পূর্ণ হওয়া বোঝায় না তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।**

শুধু অসমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে বাক্যে তৈরি হয় না। তার শেষে সমাপিকা ক্রিয়া বসে। যেমন :

কান **টানলে** মাথা আসে। বইটা **পড়ে** ফেরত দিয়ো। স্নান **করে** ভাত খাব।

৩. **একটার বেশি ক্রিয়াপদ যখন জুড়ে গিয়ে একটাই কাজ বোঝায় এবং এর প্রথমটি অসমাপিকা ও পরেরটি সমাপিকা ক্রিয়া হয় তখন তার নাম যৌগিক ক্রিয়া।** যেমন :

ঘুম থেকে **উঠে পড়ো**। লুকিয়ে সব রসগোল্লা **খেয়ে ফেলল**। দূর থেকে **দেখতে পেলাম**।

৪. **একটি ক্রিয়াপদের সঙ্গে যদি কোনো বৈশিষ্ট্যবাচক বা নামবাচক শব্দ জুড়ে একসঙ্গে একটি কাজই বোঝায় তখন**

সেগুলিকে সংযোগমূলক ক্রিয়া বলে।

যেমন :

প্রশ্ন **জিজ্ঞাসা করুন**। নদী **বয়ে চলে**। একটু কাজে **হাত লাগাও**।

৫. **কোনো কোনো ক্রিয়াপদে ব্যক্তি নিজে কাজটা করছে বা ঘটছে না বুঝিয়ে অপর কাউকে দিয়ে করানো বা ঘটানো যখন বোঝায় তখন সেগুলিকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে।** যেমন : লোক লাগিয়ে ময়লা সাফাই **করাচ্ছেন**। তোমায় এবার অঙ্ক **করাব**।

৬. **ক্রিয়াপদটিকে 'কী করে?' প্রশ্ন করে যদি বাক্যের কোনো শব্দে তার উত্তর পাওয়া যায় (অর্থাৎ যে ক্রিয়ার কর্ম রয়েছে) তাহলে তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে।** যেমন :

রোজ সে দেরি করে বাড়ি **ফেরে**। এতদিনে সে ভালো রাঁধতে **শিখেছে**। রাগ করে তিনি আর কবিতা **পড়লেন না**।

৭. **যে ক্রিয়াপদের সঙ্গে কোনো কর্মবাচক শব্দ নেই তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। এই ধরনের ক্রিয়া কেবল বাক্যের ঘটনা বা কাজটুকুই বোঝায়।** যেমন :

সে শুধু **দেখে**। সে হঠাৎ **বলে ফেলল**। আপনি কী **ভাবছেন**?

হাতে কলমে

১. নীচের শব্দাংশগুলির আগে উপযুক্ত ধাতুরূপ বসিয়ে শব্দ তৈরি করো।

শব্দগুলি দিয়ে একটি করে বাক্য বানাও :

-অন, -মান, -আই, -অক, -ইয়ে, -আ, -ওয়া

২. নীচের ধাতুগুলি থেকে বিভিন্ন ক্রিয়াপদ তৈরি করো :

√বল, √কর, √দেখ, √চল, √পড়, √বস, √খা, √দে, √পা, √গুন

৩. সিদ্ধধাতু + শব্দাংশ + ধাতুবিভক্তি — এই তিনটি উপাদান জুড়ে পাঁচটি আলাদা ক্রিয়াপদ তৈরি করো।

৪. আমি/আমরা পক্ষ, তুমি/তোমরা পক্ষ, সে/তারা পক্ষ তিনটির ক্ষেত্রে নীচের ক্রিয়াপদগুলির বিভিন্ন চেহারা কেমন হবে দেখাও :

করা, শোয়া, গাওয়া, বলা, ভাবা

৫. নীচের ক্রিয়াপদগুলির অতীত কালের রূপ দেখাও :

লেখা, পড়া, শোনা (আমি, তুমি, সে - তিনটি পক্ষে)

৬. নীচের ক্রিয়াপদগুলির বর্তমান কালের রূপ দেখাও :

পারা, দেওয়া, দেখা (আমি, তুমি, সে — তিনটি পক্ষে)

৭. নীচের ক্রিয়াপদগুলির ভবিষ্যৎ কালের রূপ দেখাও :

চলা, থাকা, খেলা (আমি, তুমি, সে — তিনটি পক্ষে)

৮. সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করে পাঁচটি বাক্য তৈরি করো।

৯. পাঁচটি বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার দেখাও।

১০. যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহার করে পাঁচটি বাক্য তৈরি করো।

১১. সংযোগমূলক ক্রিয়া ব্যবহার করে পাঁচটি বাক্য তৈরি করো।

১২. প্রযোজক ক্রিয়া ব্যবহার করে পাঁচটি বাক্য তৈরি করো।

পঞ্চম অধ্যায়

শব্দযোগে বাক্যগঠন

পরস্পর অর্থের সম্পর্কযুক্ত পদগুলি জুড়ে নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়ে যখন কোনো বক্তব্য, ধারণা বা ভাবনাকে প্রকাশ করে— সেই এককগুলিকে বলব বাক্য।

কিন্তু কথা বলার সময় একটা পদ দিয়েও বাক্যের কাজ করা হয়। যেমন :

জামাল : তুই যাবি না?

পলাশ : না।

জামাল : কেন?

পলাশ : ধুর্। গিয়ে কী করব?

জামাল : তবে?

পলাশ : তবে তুই একাই যা।

দেখো এই কথোপকথনে 'না' 'কেন', 'ধুর্', 'তবে'— চারটে শব্দ এক একটা বাক্যের মতো কাজ করছে। তাহলে একটা শব্দ দিয়েও বাক্য তৈরি হতে পারে। এগুলিকে কেউ কেউ **শব্দবাক্য** নামে চেনে। অন্যমতে এগুলো হলো আকারহীন বাক্য বা ছদ্মবাক্য। ইংরেজিতে এর একটা নাম আছে amorphous sentence. কিন্তু এগুলির মধ্যেও দেখো পুরো পুরো বাক্য লুকিয়ে ছিল। বলার সময় জামাল বা পলাশ কেটে ছোটো করে নিয়েছে। এবার পুরোটাই নতুন করে দ্যাখো :

জামাল : তুই যাবি না?

পলাশ : না, যাব না।

জামাল : কেন যাবি না?

পলাশ : ধুর্, ইচ্ছে করছে না। গিয়ে কী করব?

জামাল : তবে আমি কী করি?

পলাশ : তবে তুই একাই যা।

আসলে কিন্তু ভেতরে ভেতরে নিয়ম মেনেই বাক্য তৈরি হয়েছিল। বলার সময় ছোটো করে নিতেও অর্থের ক্ষতি হয়নি। তাহলে একই বাক্যে পদ বাড়িয়ে বাক্যটাকে বড়ো করা যায়, আবার বড়ো বাক্যগুলোকে পদ কমিয়ে ছোটো বাক্যও করে ফেলা যায়। ব্যাপারটা অনেকটা বেলুনের মতো। হাওয়া দিলে ফুলে বড়ো হয়ে উঠবে। অন্যদিকে ফোলানো বেলুনের হাওয়া বের করে দিলেই ব্যস— চুপসে এই এতটুকুন! এরকম একটা ছোট্ট বাক্যকে কেমন ফুলিয়ে বড়ো করি দেখো:

ছেলেটা যায়। (দুটো পদ)

গোয়ালা ছেলেটা রোজ যায়। (চারটে পদ)

বেঁটেখাটো গোয়ালা ছেলেটা রোজ দুধ দিতে যায়। (আটটা পদ)

হালকা নীল রঙের জামা পরা বেঁটেখাটো গোয়ালা ছেলেটা রোজ দুবেলা সাইকেল চড়ে দুধ দিতে যায়। (ষোলোটা পদ)

দুই > চার > আট > ষোলো— এক এক ধাপে দ্বিগুণ করে করে বেলুনটা ফুলেছে।

এবার উলটো দিক থেকে দেখি। মানে বেলুনটা থেকে হাওয়া কমিয়ে কমিয়ে ছোট্ট করি।

শক্তিশালী কুস্তিগীর পালোয়ান রোজ চব্বিশটা করে ডিম খায়। (আটটা পদ)
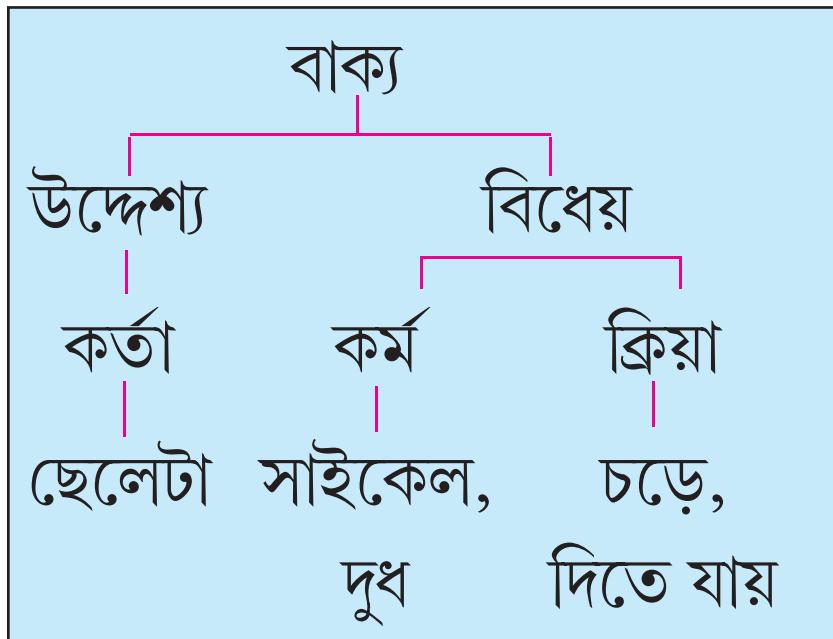
কুস্তিগীর পালোয়ান রোজ ডিম খায়। (পাঁচটা পদ)

পালোয়ান খায়। (দুটো পদ)

ছোটো থেকে বড়োই হোক আর বড়ো থেকে ছোটো--- সব বাক্যগুলিকেই দ্যাখো দুটুকরো করা যাচ্ছে উদ্দেশ্য আর বিধেয় অংশে :

(বামপক্ষ) উদ্দেশ্য	বিধেয় (ডানপক্ষ)
ছেলেটা	যায়
গোয়ালা ছেলেটা	রোজ যায়
বেঁটেখাটো গোয়ালা ছেলেটা	রোজ দুধ দিতে যায়
হালকা নীল রঙের জামা পরা বেঁটে খাটো গোয়ালা ছেলেটা	রোজ দুবেলা সাইকেল চড়ে দুধ দিতে যায়
শক্তিশালী কুস্তিগীর পালোয়ান	রোজ চব্বিশটা করে ডিম খায়
কুস্তিগীর পালোয়ান	রোজ ডিম খায়
পালোয়ান	খায়

এবার বাক্যের গঠনটাকে দেখাতে পারি এভাবে :

এখন আমরা পুরো বাক্যটার একটা চেহারা সাজিয়ে নেব :

উদ্দেশ্য অংশ			
কর্তার প্রসারক	ক্রিয়া	কর্তার প্রসারক	কর্তা
হালকা নীল রঙের জামা	পরা	বেঁটেখাটো গোয়ালা	ছেলেটা

বিধেয় অংশ				
সময় বাচক	কর্ম১	ক্রিয়া ১	কর্ম ২	ক্রিয়া ২
রোজ দুবেলা	সাইকেল	চড়ে	দুধ	দিতে যায়।

গঠন অনুযায়ী বাক্যের প্রকারভেদ : সরল, যৌগিক ও জটিল বাক্য

বেলুন ফোলানো আর বেলুনের হাওয়া বের করার কথাটা মনে আছে তো? একটা ছোটো বাক্যকে কেমন ফুলিয়েফাঁপিয়ে বড়ো করা যায় আবার বড়ো বাক্যের অনেক উপাদান বেরিয়ে গিয়ে কেমন চুপসে ছোটো হয়ে যায়। বাক্যের আকার বা গঠনের আরও নানান বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এবার সেগুলির বিষয়ে জানব।

অধ্যায়ের মধ্যে যেসব বাক্য উদাহরণ হিসেবে দেখেছি--- গঠনগত দিক থেকে সেগুলোর

সবকটিই **সরলবাক্য**। গঠনের দিক থেকে আরও দুরকম বাক্য হয়। একটার নাম **যৌগিক বাক্য**, আর একটার নাম **জটিল বাক্য**। এই তিনটি প্রধান রূপভেদ ছাড়াও আরেকটি রয়েছে — সেটার নাম **মিশ্রবাক্য** (এটা অবশ্য আগের তিনটের মতো নির্দিষ্ট একটি গঠনের নিয়ম মেনে তৈরি নয়।)

সরলবাক্য

বাক্যের গঠনগত বৈশিষ্ট্য দেখতে গিয়ে এতক্ষণ যা যা চিনেছি আর দেখেছি তার প্রায় সবটাই সরলবাক্যের নিয়মের মধ্যে পড়ে। এবার সেগুলিকে বৈশিষ্ট্যের মতো সাজিয়ে নেব :

(ক) বাক্যগুলি একটাই সমাপিকা ক্রিয়া নিয়ে গঠিত হয়।

(খ) বাক্যগুলিতে অসমাপিকা ক্রিয়া থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। থাকলে

একটির বেশি অসমাপিকা ক্রিয়াও থাকতে পারে।

(গ) বাক্যগুলি অন্য কোনো বাক্যের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে।

(ঘ) বাক্যগুলিতে কখনও কর্তা অংশ উহ্য বা গোপন থাকে, আবার কখনও বা সমাপিকা ক্রিয়াও অনুক্ত থাকে।

এগুলি থেকেই পেয়ে যাব **তিন ধরনের** সরলবাক্য :

(১) কর্তাযুক্ত ক্রিয়াযুক্ত সরলবাক্য

কর্তার সঙ্গে একটা সমাপিকা ক্রিয়াসহ এই সরল বাক্যগুলি যেমন তৈরি হবে, তেমনি এক বা একের বেশি অসমাপিকা ক্রিয়াও তার সঙ্গে জুড়ে বসতে পারে।

(ক) তুমি দাও [কর্তা + সমাপিকা ক্রিয়া]

(খ) তুমি মুকুলিকাকে উপহারটা দাও [কর্তা + গৌণকর্ম + মুখ্যকর্ম + ক্রিয়া]

(গ) তুমি আজ মুকুলিকাকে উপহারটা দাও [কর্তা + সময়বাচক + গৌণকর্ম + ...]

(ঘ) তুমি এই মঞ্চে আজ মুকুলিকাকে উপহারটা দাও [কর্তা + স্থানবাচক + ...]

(ঙ) তুমি এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আজ মুকুলিকাকে উপহারটা দাও [কর্তা + স্থানবাচক + অসমাপিকা ক্রিয়া + ...]

(চ) তুমি এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে অন্ধদের জন্য ওর কাজের কথা সকলকে জানিয়ে আজ মুকুলিকাকে উপহারটা দাও। [কর্তা + স্থানবাচক + অসমাপিকা ক্রিয়া + অসমাপিকা বাক্যখণ্ড + ...]

শেষ বাক্যটার পরিচয় দিতে গিয়ে একটা নতুন জিনিস বলা হলো— **অসমাপিকা বাক্যখণ্ড**।

নতুন জিনিস বলব না কারণ ব্যাপারটা আমরা আগেও দেখেছি। তাই বলব নতুন নাম। দ্যাখো (চ)-এর সরলবাক্যটাকে তিনটে সরলবাক্য বানিয়ে ছোটো ছোটো করব—

চ. (১) তুমি এই মঞ্চে দাঁড়াও।

চ. (২) তুমি অন্ধদের জন্য মুকুলিকার কাজের কথা সকলকে জানাও।

চ. (৩) তুমি আজ মুকুলিকার কাজের কথা সকলকে জানাও।

চ. (৪) তুমি আজ মুকুলিকাকে উপহারটা দাও।

এই তিনটেই দেখে নাও কর্তাযুক্ত + সমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত সরলবাক্য। কিন্তু (চ)-এর বাক্যটা কী

করেছে (চ.১) আর (চ.২)-এর শেষে সমাপিকা ক্রিয়াগুলোকে (দাঁড়াও, জানাও) দুটো অসমাপিকা ক্রিয়া বানিয়ে নিয়েছে (দাঁড়িয়ে, জানিয়ে)। (চ.১) আর (চ.২) আসলে দুটো সরলবাক্যই, কিন্তু বড়ো (চ) বাক্যটাতে ঢুকে সেগুলি মূল বাক্যের ভেতর এক একটা টুকরো অংশ হয়ে গেছে। তারপর কাজটাও সম্পূর্ণ হচ্ছে না বলে এগুলি **অসমাপিকা বাক্যখণ্ড**। এগুলির কথা ভুলে যেয়ো না।

এবার আরও কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। তোমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে এগুলি কেন সরলবাক্য।

মাদল বেশ ভালো গান করে।

বারণ করলেও সুনীল কথা না শুনে শব্দবাজি ফাটাচ্ছিল।

এক রাজার বাড়ির জানালার পাশে টুনটুনি বাসা বাঁধল।

বলাই খুব গাছপালা নিয়ে মেতে থাকে।

অনেক দূর থেকে একটা বাঁশির সুর ভেসে আসছে।

(২) কর্তাযুক্ত ক্রিয়াহীন সরলবাক্য

কর্তা আর কর্তার সম্প্রসারক নানা অংশ এই বাক্যগুলিতে থাকলেও সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে কোনো ক্রিয়ার ব্যবহার থাকে না; ক্রিয়া অনুক্ত বা উহ্য থাকে।

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।

এখানে 'আমরা সবাই (হলাম) রাজা' কথাটার ক্রিয়াপদ 'হলাম'-টা অনুক্ত আছে। এরকম আরও কিছু সরলবাক্য হলো :

তারা খুব উঁচু জাতের লোক।

গলদা চিংড়ি, কাতলা, ইলিশ মিলিয়ে

এলাহি আয়োজন!

অমল, বিমল, কমল আর ইন্দ্রজিৎ

সকলেই বেশ ভালো ছেলে।

কাহার পাড়ার পালকিগুলো বেশ রংচঙে।

পালোয়ানের ইয়া বড়ো বড়ো গোঁফের

ফাঁকে পাখির মতো কটা দাঁত!

এই বাক্যগুলির কর্তা খুঁজে দেখাও। তারপর দেখাও অনুক্ত ক্রিয়াগুলোকে।

(৩) কর্তাহীন ক্রিয়াযুক্ত সরল বাক্য

এই সরল বাক্যগুলিতে ক্রিয়াখণ্ড বা বিধেয় অংশটাই কেবল থাকে। কর্তা খণ্ড বা উদ্দেশ্য অংশ এখানে অনুক্ত থাকে; প্রত্যক্ষভাবে কর্তার উপস্থিতি থাকে না।

আর কতবার একই পড়া পড়ব?

নাক বরাবর সিধে চলে যেতে হবে।

রাত হলেই বেহালা বাজানো শুরু হয়।

গ্রীষ্মকালে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হয় একটু খাবারের আশায়।

পড়াশোনা করতে বসত।

এই পাঁচটা বাক্যের অনুক্ত কর্তাখণ্ডগুলির পাঁচটা উদাহরণ দেব :

প্রথম বাক্য : আমরা এই পাঁচজন ছাত্র

দ্বিতীয় বাক্য : আপনাকে

তৃতীয় বাক্য : অন্ধ ভিখিরিটির

চতুর্থ বাক্য : কলকাতা শহরের কুকুরগুলোকে

পঞ্চম বাক্য : ছেলেবেলায় বাবারা চার ভাইবোনে মিলে

এবার তোমাদের কাজ হলো এই পাঁচটা সরল বাক্যের আরো পাঁচটা অনুক্ত উদ্দেশ্য অংশ তৈরি করা। দেখো তো পার কি না? সবশেষে তাহলে বলতে পারি :

একটাই সমাপিকা ক্রিয়া (উক্ত বা অনুক্ত) নিয়ে গঠিত যে বাক্যগুলিতে এক বা একের বেশি অসমাপিকা ক্রিয়া থাকতেও পারে কিন্তু সেগুলি অন্য বাক্যের সঙেগ যুক্ত না হয়ে স্বতন্ত্র থাকলে তাকে বলে সরল বাক্য।

যৌগিক বাক্য

যৌগ কথাটার মানে হলো দুই বা তার বেশি জিনিস জুড়ে গিয়ে একটা জিনিসে রূপান্তরিত হওয়া।

যৌগিক বাক্য হলো একের বেশি সরল বাক্যকে জুড়ে একটা বাক্য তৈরি করা।

এবার তৈরি করা শুরু করি :

লোকটা মাছ ধরতে ভালোবাসে। (সরল বাক্য ১)

লোকটা মাছ খেতে একদম ভালোবাসে না। (সরল বাক্য ২)

এবার পাশাপাশি রেখে জুড়তে পারি:

লোকটা মাছ	ধরতে ভালোবাসে	কিন্তু	লোকটা মাছ	খেতে একদম ভালোবাসে না।
সাধারণ অংশ	ভিন্ন অংশ	যোজক পদ	সাধারণ অংশ	ভিন্ন অংশ
সরল বাক্য ১		যোজক		সরল বাক্য ২

তাহলে যৌগিক বাক্যটা এরকম হবে :

লোকটা মাছ ধরতে ভালোবাসে কিন্তু লোকটা মাছ খেতে একদম ভালোবাসে না।

এই বাক্যটার মধ্যে ‘লোকটা মাছ’ অংশটা দু-বার আছে। কারণ মূল দুটি সরল বাক্যেই এই অংশটা ছিল। তাই এটা সাধারণ অংশ। এই অংশটা যৌগিক বাক্যে একবার ব্যবহার করলেই ভালো লাগে। এবার যৌগিক বাক্যটা আসলে কেমন হবে দেখো :

লোকটা মাছ ধরতে ভালোবাসে কিন্তু খেতে একদম ভালোবাসে না।

সরল বাক্যদুটিকে আগে পরে জায়গা বদল করেও জোড়া যেত :

লোকটা মাছ খেতে একদম ভালোবাসে না কিন্তু ধরতে ভালোবাসে।

ওই দুটো সরল বাক্য দিয়ে এটা আরেক রকম যৌগিক বাক্য। প্রতিবারই 'কিন্তু' শব্দটাকে আমরা **যোজক পদ** হিসেবে ব্যবহার করেছি।

একাধিক সরল বাক্যকে যে পদ/পদগুলি দিয়ে জুড়ে একটি যৌগিক বাক্যে রূপান্তরিত করা যায়, সেগুলিকে **যোজক পদ** বলে। যোজক পদগুলি আবার ব্যবহার অনুযায়ী বা অর্থ অনুযায়ী কয়েকরকম হয়।

কিছু যোজক পদ সংযোজনের কাজ করে। যেমন : এবং, ও, আর, সুতরাং।

কতগুলি বিয়োজনের কাজ করে। যেমন : কিন্তু, অথচ, অথবা, বা, নয়।

কতগুলি বিকল্পের কাজ করে। যেমন : বরং, তবুও, তথাপি।

সাধারণভাবে যোজকগুলি এই ধরনের অর্থ প্রকাশ করলেও, কখনো অন্যরকমভাবেও ব্যবহৃত হতে পারে।

এবার আমাদের পুরোনো যৌগিক বাক্যটাকে নতুন করে লিখতে পারি যোজক পদ বদল করে। নতুন চেহারা কেমন হবে দেখো :

লোকটা মাছ ধরতে ভালোবাসে **অথচ** খেতে একদম ভালোবাসে না।

লোকটা মাছ ধরতে ভালোবাসে **তবুও** খেতে একদম ভালোবাসে না।

অন্য কোনো যোজক পদ দিয়ে আর জোড়ার চেষ্টা করলে অর্থ পাওয়া যাবে না। যোজক পদ থাকলেই যৌগিক বাক্য চেনা যায় — এটা একটা সহজ সূত্রের মতো অনেকে মনে রাখে। কিন্তু আমরা দুধরনের ব্যতিক্রম লক্ষ করব :

(১) মৈনুদ্দিন **আর** ঢোলগোবিন্দ দুজনে মিলে বাজার করতে যাচ্ছে।

এখানে একটা যোজক পদ রয়েছে (আর) কিন্তু এটা যৌগিক বাক্য নয়। কারণ মৈনুদ্দিন আর ঢোলগোবিন্দ লোকদুটির নামকে কেবল ওই যোজকটা দিয়ে জোড়া হয়েছে। এই বাক্যে দু-বার কাজের বা ক্রিয়ার উল্লেখ থাকছে না বলে একটাই সমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে শেষ হওয়া এই বাক্যটা একটা সরল বাক্য। এটা যৌগিক বাক্য হতো যদি এমন করে লেখা যেত :

মৈনুদ্দিন বাজার করতে যাচ্ছে আর ঢোলগোবিন্দও তার সঙ্গে বাজার করতে যাচ্ছে।

তাহলে ভালো করে চিনে রাখো এই বাক্যগুলিকে, যেগুলিতে যোজক পদ থাকলেও যৌগিক বাক্য হচ্ছে না :

- সুখেন মুর্মুর বড়ো ছেলেটার নাম পলাশ আর ছোটোটার নাম শিমুল।
- কিছু জামাকাপড়, চালডাল আর পথ খরচার টাকা নিয়ে সে দেশভ্রমণে বের হলো।
- সুতৃপ্তি এবং সাকিলা দুজনেই গান শিখতে যায়।
- প্রচুর খাবার খেতে দীপ্তিমান ও রঞ্জন দুজনেরই জুড়ি মেলা ভার।
- তুমি, আমি বা ঝুম্পা কেউ একজন যাবে।

(২) আজ যেতে পারি, কাল যেতে পারি, পরশু পারব না।

এই বাক্যটাতে কোনো যোজক পদ নেই। বলতে পারি এখানে যোজক পদ অনুক্ত বা উহ্য

রয়েছে। যোজক পদ বসিয়ে এই যৌগিক বাক্যটা তৈরি হলে এরকম হতো :

আজ যেতে পারি **বা** কাল যেতে পারি **কিন্তু** পরশু পারব না।

এবার তাহলে চিনে রাখো সেই বাক্যগুলিকে, যেগুলিতে যোজক পদ না থাকলেও আসলে যৌগিক বাক্যেরই কাজ করছে।

- বাঁদরগুলো গাছ থেকে নেমে এল, পটাপট কাঁদি থেকে কলা ছিঁড়তে শুরু করল।
- অধরবাবু পেটমোটা লোক, খেতে পারেন ভালো।
- সুরেন একহাতে নরেনকে ধরল, অন্য হাতে জসিমকে।
- নয়না দেবী গান খুবই পছন্দ করেন, নাচ ততটা নয়।

- ভারতবর্ষে ভাষা, মত, পরিধানে বিভেদ রয়েছে, তারই মাঝে ভারতবাসীর মিলনও মহান।

তোমরা ওপরের পাঁচটা যৌগিক বাক্যে যোজক পদ বসানোর চেষ্টা করে দেখো।

সবশেষে মনে রাখো যে, **যোজক পদ** বসানো যৌগিক বাক্যের সংখ্যাই বেশি। সাধারণভাবে যৌগিক বাক্য বলতে এগুলিকেই চিনব :

- ওরা খাবার ফেলে দিয়ে নষ্ট করে **তবু** গরিবদের দিতে পারে না।
- শক্তিবাবুর ছেলে জয়দীপ খেলাধুলোয় ভালো **কিন্তু** প্রচুর পড়াশোনাও করে।
- তোমরা সাঁতার জান না **সুতরাং** গভীর সমুদ্রে যাবার চেষ্টা কোরো না।

- চুপচাপ বসে না থেকে আঁকতে পারো **অথবা** গল্পের বই পড়তে পারো।
- গ্রামের শেষ প্রান্তে বিদ্যাধরী নদী **আর** জলে নামলেই কামটের ভয়।
- বলরামকে বল কাঠ না কাটতে **বরং** ও যেন আগে জল তুলে দেয়।
- তুমি গেলে যাও **নয়** শিবরামকে বলো **বা** ওর ভাইকে যেতে বলো।
- দলমার হাতিগুলো নেমে আসে **এবং** ফসলের ক্ষতি করে **তবু** গ্রামের মানুষ অনেক সহিষ্ণু।

যে সরল বাক্যগুলিকে যোজক পদের সাহায্যে জুড়লে যৌগিক বাক্য হয়, সেগুলি যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত বাক্যাংশ বা বাক্যখণ্ড হয়ে যায়। কিন্তু জুড়ে দেবার পর ওই বাক্যগুলির যে অর্থ ছিল তা যেমন বদলায় না, বাক্যগুলির গঠনও খুব একটা পাল্টায় না।

রিখিয়া পড়ার টেবিলে বই খুলে বসে কিন্তু তার পড়ায় একেবারে মন নেই।

প্রথম অংশটা আর দ্বিতীয় অংশটা আলাদা করো। দেখো দুটোই দুটো সরল বাক্য হচ্ছে। দুটোর কোনোটারই মানে বদলায়নি। গঠন হয়তো সামান্যই বদলেছে। যেমন :

রিখিয়ার পড়ায় একেবারে মন নেই।

এই সরল বাক্যটার 'রিখিয়ার' বদলে 'তার' শব্দটা পুনরাবৃত্তি এড়াতে ব্যবহার হয়েছে।

তাহলে এই অংশটা থেকে কী জানলাম?

জানলাম যে, **দুই বা তার বেশি সরল বাক্যের গঠন বা অর্থ খুব একটা না বদলে যদি যোজক পদের সাহায্যে জুড়ে একটি নতুন বাক্য তৈরি হয় সেটাই হলো যৌগিক বাক্য।**

শেষে অবশ্য এটাও মনে রাখব যে, কোনোই সম্পর্ক নেই এমন দুটো সরল বাক্যকে যোজক পদ দিয়ে জুড়ে দিলেই চলবে এমন হয় না। দুটোর মধ্যে একটা অন্তত অর্থের যোগ থাকতে হবে।

- তুমি কারো কথা শোনো না তাই বাজারে জিনিসের দাম হু হু করে বাড়ছে।
- বই থেকে ইতিহাস পড়ছি কিন্তু বেশি বৃষ্টি হলেই রাস্তাঘাটে জল দাঁড়িয়ে যায়।
- পড়াশোনা না করে সিনেমা দেখছে অথচ চিড়িয়াখানার কচ্ছপটার বয়স একশো পেরিয়ে গেল।

বুঝতেই পারছ একটার সঙ্গে অন্য সরল বাক্যটার কোনো অর্থের মিল না থাকায় এই যৌগিক বাক্যগুলিরও কোনো অর্থ হয় না। দেখে মনে হচ্ছে এগুলি যৌগিক বাক্য; কিন্তু সত্যিই কোনো অর্থ আছে কি?

দেখো তো বন্ধুরা মিলে খেলার সময় এমন কয়েকটা অর্থহীন যৌগিক বাক্য মজা করার জন্য বানাতে পারো কি না!

প্রথাগত যোজক পদের বাইরেও অন্য বিভিন্ন ধরনের পদ দিয়ে অবশ্য যৌগিক বাক্যে এই জোড়ার কাজটা করা হয়। যেমন :

ইদের সময় ভালো জামাকাপড় কেনে **তা বলে** কি সারাবছর কেনে না ভেবেছ?

তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে থাকতে পারো **অবশ্য** তাতে কোনো লাভ নেই।

উনি এমনিতে খুব কিপটে মানুষ **তবে কি না** বই কেনার সময় টাকার খেয়াল থাকে না!

টপাটপ আম কুড়োবে **না তো কি** হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে আম গাছটাকেই দেখব!

জটিল বাক্য

যৌগিক বাক্যে দুটি বা তার বেশি সরল বাক্যকে যোজক পদ দিয়ে জোড়া হয়েছিল। জুড়ে যাবার পর কিন্তু সরল বাক্য রইল না। যৌগিক বাক্যটার মধ্যে ওই অংশগুলি হয়ে গেল বাক্যটার অন্তর্গত খণ্ডবাক্য। যোজক পদ দিয়ে জোড়া এই বাক্যখণ্ডগুলির অর্থ যেমন বদলাল না; গঠনও খুব একটা পালটাল না। তাই বলা হয় : **যৌগিক বাক্যের বাক্যখণ্ডগুলির পরস্পর নির্ভরতা নেই**। তার মানে হলো একটা বাক্যখণ্ড বললেও একটা সম্পূর্ণ অর্থ পাচ্ছিলাম। তাই বাক্যখণ্ডগুলি স্বাধীন অর্থপূর্ণ। যেমন মনে করে দেখো :

জয়দীপ খেলাধুলোয় ভালো কিন্তু প্রচুর পড়াশোনাও করে।

'জয়দীপ খেলাধুলোয় ভালো' — এই অংশটা বললে পরের অংশটা বলতেই হবে, এমন নয়।

আবার ‘জয়দীপ প্রচুর পড়াশোনাও করে’ বললে আগের অংশটা ছাড়া কথাটা অসম্পূর্ণ লাগছে এমন নয়। কিন্তু বাক্যটাকে এবার নতুন করে যদি এমনভাবে শুরু করতাম :

জয়দীপ যেমন খেলাধুলোয় ভালো

এইভাবে শেষ করে দিলে কিন্তু মনে হচ্ছে কী একটা যেন বলা বাকি আছে।

আবার শুধু দ্বিতীয় খণ্ডবাক্যটাকে যদি এমনভাবে সাজাতাম :

তেমনি জয়দীপ প্রচুর পড়াশোনাও করে

এখানে দেখো কেমন মনে হচ্ছে যে বাক্যটার আগে আরো কিছু বলা রয়েছে। না হলে এবারও বাক্যটাকে অসম্পূর্ণ মনে হচ্ছে! দুটোকে এবার পরপর সাজিয়ে লেখো। দেখবে ওই খটকা চলে গেছে :

জয়দীপ যেমন খেলাধুলোয় ভালো
তেমনি প্রচুর পড়াশোনাও করে।

এবার আর অসুবিধে নেই তো? এরকম বাক্য হলে তাকে বলি জটিল বাক্য।

জটিল বাক্যের বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝে নেবার চেষ্টা করি :

- জটিল বাক্যও (যৌগিক বাক্যের মতো) দুই বা দুইয়ের বেশি সরল বাক্য জুড়ে তৈরি হয়। যেগুলিকে জটিল বাক্যটির মধ্যে খণ্ডবাক্য হিসেবে পাওয়া যায়।
- জটিল বাক্যের খণ্ডবাক্যগুলির মধ্যে পরস্পর নির্ভরতা থাকে। একে অনেক সময় পরিপূরকতা বলে। অর্থাৎ একটি অপরটিকে ছাড়া অসম্পূর্ণ মনে হয়।
- এই খণ্ডবাক্যগুলির মধ্যে একটি প্রধান হয় এবং অন্যটি বা অন্যগুলি সেটির তুলনায়

ততটা গুরুত্বপূর্ণ হয় না। এগুলিকে বলে **অপ্রধান খণ্ডবাক্য, আশ্রিত খণ্ডবাক্য বা নির্ভরশীল খণ্ডবাক্য**। মূলটিকে বলে **প্রধান খণ্ডবাক্য বা স্বাধীন খণ্ডবাক্য**।

(যৌগিক বাক্যে দেখেছিলাম, দুটি খণ্ডবাক্যেরই অর্থগত গুরুত্ব থাকে)

- প্রধান খণ্ডবাক্যে সাধারণত বাক্যের প্রধান সংবাদ বা কাজটি বোঝায়। অপ্রধান খণ্ডবাক্য বা খণ্ডবাক্যগুলিতে সেই সংবাদ বা কাজের একটু বিস্তার, পরিচিতি বা সীমানা নির্দেশ করা হয়।

যে দিনগুলো চলে গেছে	তা আর ফিরে আসবে না
প্রধান খণ্ডবাক্য	অপ্রধান খণ্ডবাক্য
জটিল বাক্য	

ওপরের বাক্যটাতে মূল তথ্য বা সংবাদ হলো: জীবনের কতগুলি দিন কেটে গেছে। তাই এটা প্রধান খণ্ডবাক্য। অর্থের দিক থেকে এটা পরেরটার ওপর নির্ভর করে না। কিন্তু পরেরটা দেখো এই খণ্ডবাক্যটার ওপরে নির্ভর না করলে তার অর্থ স্পষ্ট হয় না। তাই পরের খণ্ডবাক্যটার গুরুত্ব একটু কম বলে এটা অপ্রধান খণ্ডবাক্য। দ্বিতীয়টা প্রথম সংবাদটারই একটু সীমানা নির্দেশ করে দিচ্ছে।

এই অপ্রধান খণ্ডবাক্য/খণ্ডবাক্যগুলির সঙ্গে প্রধান খণ্ডবাক্যগুলির সম্পর্ক জটিল বাক্যের ক্ষেত্রে তিনরকম উপায়ে তৈরি হয়। এগুলিকে এবার উদাহরণ দিয়ে চিনে নেব :

(১) শর্তবাক্য বা সাপেক্ষবাচক জটিল বাক্য

এই ধরনের জটিল বাক্যগুলির প্রধান খণ্ডবাক্যে একটা শর্ত থাকে আর আশ্রিত খণ্ডবাক্যে তার

একটা সম্ভাব্য সমাধান বা পরিণতি নির্দেশ করা থাকে।

প্রধান খণ্ডবাক্যের সঙ্গে ‘যদি’ আর অপ্রধান খণ্ডবাক্যের সঙ্গে সেই শর্তের সাপেক্ষে ‘তবে’, ‘সেক্ষেত্রে’, ‘তো’, ‘তাহলে’ শব্দগুলো দিয়ে বাক্যখণ্ডগুলিকে জুড়ে জটিল বাক্য করা হয়।

খেলোয়ারটি	**যদি**	শেষ বলে ছয় মারতে পারে	**তবেই**	ওদের দল খেলায় জিতবে
	সাপেক্ষ পদ		সাপেক্ষ পদ	
প্রধান খণ্ডবাক্য (যদি)			অপ্রধান খণ্ডবাক্য (তবে)	

এই জাতীয় জটিল বাক্যগুলিতে যেমন সাপেক্ষবাচক পদ থাকে, তেমনি আবার কখনো

কখনো নাও থাকতে পারে। এই ধরনের কয়েকটা জটিল বাক্য দেখে নাও :

(ক) মেজদা **যদি** আর আমাদের বকে **তাহলে** পিসিমার কাছে নালিশ করব।

(খ) **যদি** ছেলেগুলো সাপটাকে না মারত, নির্ঘাত একটা দুর্ঘটনা ঘটত। ('তবে' অনুক্ত)

(গ) কাছাকাছি কোথাও আশ্রয় পাও **তো** রাতটা সেখানেই **কাটিও**। ('যদি' উহ্য)

(ঘ) তুমি সারাদিন ভালো হয়ে থাকো, ফিরে এসে আইসক্রিম খাওয়াব। ('যদি' 'তবে' দুটোই উহ্য)

(২) প্রধান ও আশ্রিত সম্পর্কের জটিল বাক্য

এই ধরনের জটিল বাক্যগুলিতে অপ্রধান/আশ্রিত খণ্ডবাক্যগুলি প্রধান খণ্ডবাক্যের আশ্রিত হয়ে

থাকে। প্রধান খণ্ডবাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কর্মটি এখানে একটা শব্দ নয়, বরং সেটা একটা বা একের বেশি অপ্রধান খণ্ডবাক্য হয়ে থাকে।

তমালবাবু লক্ষ করলেন	ছেলেটি ইদানীং খুব মিথ্যে কথা বলতে শিখেছে
প্রধান খণ্ডবাক্য	আশ্রিত খণ্ডবাক্য

তমালবাবু কী লক্ষ করলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যাবে ক্রিয়ার কর্ম অংশটি। এই জটিল বাক্যে সেটা নিজেই একটা খণ্ডবাক্য। ছেলেটি ইদানীং খুব মিথ্যে কথা বলতে শিখেছে।

এই ধরনের জটিল বাক্যগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে ‘যে’ শব্দটিকে খণ্ডবাক্যগুলির যোজকের মতো ব্যবহার করা হয়।

এবার এগুলির কয়েকটি উদাহরণ দেখে নিই (সব ক্ষেত্রে আশ্রিত খণ্ডবাক্যগুলি মোটা হরফে দেখানো হয়েছে) :

(ক) আমি বুঝিয়ে বললাম যে **উনি এমনটা করতেই পারেন না**।

(খ) উপেন বিনীতভাবে বলল '**আজ্ঞে আমদুটো আমি চুরি করিনি**'।

(গ) কবিরাজ রোগীকে '**পেটব্যথা হয় তুমি জানতে পার না**' বলে তেড়ে ধমক দিলেন।

(ঘ) এখন আমাদের জানতে হবে যে **প্রতি বছর কত শিশু পোলিয়োতে পঙ্গু হয়ে পড়ে**।

(৩) পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত সর্বনামযুক্ত জটিল বাক্য

যে-সে, যার-তার, যেগুলি-সেগুলি, যত-তত, যখন-তখন, যবে-তবে, যেখানে-সেখানে, যা-তা

— এইরকম কতগুলি জোড় শব্দের একটা বাক্যে বসলে আরেকটাও বসে। এগুলিকে বলে **পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত সর্বনাম** বা **নিত্যসম্বন্ধী সর্বনাম**। এগুলির একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের সঙ্গে এবং অন্যটি অপ্রধান খণ্ডবাক্যের সঙ্গে জুড়ে এই জাতীয় জটিল বাক্যগুলি তৈরি হয়।

(ক) **যারা** লুকিয়ে হরিণ শিকার করে **তারা** প্রকৃতি ও মানুষের শত্রু।

(খ) এই বইটা **যত** নিজে নিজে বুঝে পড়বে **ততই** ভালো ফল করতে পারবে।

(গ) **যেখানে** মানুষ সাম্প্রদায়িক **সেখানে** মনুষ্যত্বেরই অপমান।

(ঘ) **যিনি** আল্লা **তিনিই** গড **তিনিই** আবার ভগবান।

(ঙ) **যার যত** বেশি টাকা, **তার তত** বেশি অশান্তি!

(চ) **যত** বেশি চিনি দেবে **তত** বেশি মিষ্টি হবে।

(ছ) পুলিশ **যখন** গিয়ে দরজা ভাঙল **তখন** ওরা চুরি করা জিনিস ভাগ করতে বসেছে।

এই উদাহরণগুলির শেষে একবার মিলিয়ে দেখে নিই জটিল বাক্য কাকে বলে?

প্রধান খণ্ডবাক্যের সঙ্গে অপ্রধান খণ্ডবাক্য/খণ্ডবাক্যগুলি যখন পরিপূরক সম্পর্কে এমনভাবে যুক্ত হয় যাতে অপ্রধান খণ্ডবাক্যগুলি প্রধান খণ্ডবাক্যটির আশ্রিত মনে হয় — সেই ধরনের বাক্যগুলিই হলো জটিল বাক্য।

অস্ত্যর্থক ও নঞর্থক বাক্য

শব্দযোগে বাক্য কী করে তৈরি হয় তা দেখলাম। বাক্যের গঠন অনুযায়ী সেগুলিকে যেমন

তিনভাগে ভাগ করা যায় তারও পরিচয় পেলাম। এবার কয়েকটা বাক্য সাজাচ্ছি দেখো :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম আমরা সবাই জানি।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম আমাদের কারও অজানা নয়।

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম কে না জানে?

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম কেউ জানে না, এমন নয়!

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম যে সবাই জান সেটা বলো।

একটু মন দিয়ে দেখো : বাক্যগুলি আলাদা আলাদাভাবে লেখা রয়েছে বটে, কিন্তু সবকটা বাক্য একই কথা বলতে চাইছে না? তাহলে একই মানে হয় এমন বাক্যকে এখানে পাঁচরকম ভঙ্গি বা কৌশলে লেখা হলো। ব্যাকরণে এগুলির

আবার আলাদা আলাদা নামও আছে। যেমন, পরপর দেখলে — প্রথমটা **অস্ত্যর্থক বাক্য**, দ্বিতীয়টা **নঞর্থক বাক্য**, তৃতীয়টা **প্রশ্নবোধক বাক্য**, চতুর্থটা **বিস্ময়সূচক বাক্য** আর শেষেরটা **অনুজ্ঞাবাচক বাক্য**।

এখানে বাক্যের গঠন নয়, বরং বাক্যটা কীভাবে বলা বা লেখা হচ্ছে — তার পদ্ধতি বা ভঙ্গি অনুযায়ী এতরকমভাবে একই কথা বলা সম্ভব। আমরা এর মধ্যে প্রথম দুটোকে দেখব। প্রথমটার নাম **অস্ত্যর্থক বাক্য**, **সদর্থক বাক্য** বা **হ্যাঁ বাচক বাক্য**। দ্বিতীয়টা হলো **নঞর্থক বাক্য** বা **না বাচক বাক্য**।

- ‘লোকটা খুব বুদ্ধিমান’ কথাটার উলটো নিশ্চয়ই হবে ‘লোকটা খুব নির্বোধ’।
- ‘এই পৃথিবীর অনেক কিছুই জানি’ কথাটার উলটো ‘পৃথিবীর অনেক কিছুই জানি না’।

বাঁদিকের প্রথম বাক্যদুটো হ্যাঁ বাচক অর্থ প্রকাশ করছে। কিন্তু ডানদিকের বাক্যগুলি তার বিপরীত অর্থ প্রকাশ করলেও পার্থক্যটা কি খেয়াল করেছ? 'লোকটা খুব নির্বোধ' — এতে কোনো 'না' বা 'নয়' জাতীয় শব্দ নেই। কিন্তু 'পৃথিবীর অনেক কিছুই জানি না' বাক্যটার শেষে না বাচক শব্দটা বোঝা যাচ্ছে।

তাহলে যে ধরনের বাক্যে কোনো ঘটনার উল্লেখ, ইচ্ছে প্রকাশ, কোনো বস্তুর উল্লেখ ইত্যাদি সদর্থক বা স্বীকৃতিসূচক তথ্য দেওয়া হয় — সেগুলি হলো অস্ত্যর্থক বাক্য।

আবার **যে ধরনের বাক্যে কোনো বিষয়ে বারণ করা, অস্বীকৃতি জানানো বা অনিচ্ছা প্রকাশ করা হয় — সেগুলি হলো নঞর্থক বাক্য।**

বাংলায় এই দুধরনের বাক্যকে অবশ্য **নির্দেশক বাক্য**-র দুটি ভাগ বলে মনে করা হয়।

অস্ত্যর্থক বাক্যে ‘হ্যাঁ’ শব্দটার উল্লেখ থাকা জরুরি নয় বলেই হ্যাঁ-এর উল্লেখ থাকে না বললেই চলে। কিন্তু নঞর্থক বাক্যে ‘না’ অথবা তার সমগোত্রীয় নিষেধবাচক শব্দের উল্লেখ থাকা জরুরি। যেমন ঃ নয়, নি, নেই, নহে, নও ইত্যাদি।

এবার অর্থের দিক থেকে একটা দরকারি জিনিস একটু মন দিয়ে বুঝতে হবে। আমরা কয়েকটা বাক্যের উদাহরণ দিই :

(ক) মাস্টারমশাই সবই পড়িয়েছেন।

এটা নিশ্চয়ই একটা অস্ত্যর্থক বা হ্যাঁ সূচক বাক্য এতে সন্দেহ নেই। আবার :

(খ) মাস্টারমশাই কিছুই পড়াননি।

এটা একটা নঞর্থক বাক্য বা না সূচক বাক্য। কিন্তু এটা অস্ত্যর্থক বাক্যটার বিপরীত অর্থ বোঝায়। তোমায় যদি বলা হয়, একটা অস্ত্যর্থক বাক্যকে নঞর্থক বাক্যে বদলাও বা রূপান্তরিত

করো — তাহলে কিন্তু বিপরীতার্থক না বাচক বাক্য লিখলে চলবে না। অস্ত্যর্থক বাক্যকে নঞর্থক বাক্য করতে গেলে অর্থ বদলালে চলবে না। তাহলে ঐ অস্ত্যর্থক বাক্যটার সমার্থবাচক নঞর্থক বাক্যটা কী হবে? সেটা হবে :

মাস্টারমশাই কিছুই পড়ানো বাকি রাখেননি।

বা

মাস্টারমশাই কোনো পড়াই বাকি রাখেননি।

সুতরাং না বাচক দুটো বাক্যেরই মানে দাঁড়াচ্ছে — মাস্টারমশাই সবটাই পড়িয়েছেন। এভাবে বাক্য বদল করলে বলতে পারি অর্থ এক রেখে অস্ত্যর্থককে নঞর্থক করা হলো। এবার ওই (খ) বাক্যটা, মানে নঞর্থক বাক্যটা নেব। সেটারও অর্থ না বদলে অস্ত্যর্থক করলে কেমন হবে দেখো:

মাস্টারমশাই কিছুই পড়ান নি। (নঞর্থক)

এটা রূপান্তরিত হলে হবে :

মাস্টারমশাইয়ের সব কিছুই পড়ানো বাকি আছে। (অস্ত্যর্থক)

অনেক সময় মনের ভাব একটু জোরালোভাবে ব্যক্ত করতে আমরা একই বাক্যের অস্তর্থক ও নঞ্‌র্থক রূপকে পরপর জুড়েও দিই। যেমন :

মাস্টারমশাই সবই পড়িয়েছেন। ওনার আর কিছু পড়াতে বাকি নেই।

মাস্টারমশাই কিছুই পড়ান নি। ওনার এখনো সব পড়ানো বাকি রয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে এবার অর্থ এক রেখে কীভাবে অস্ত্যর্থককে নঞর্থক বাক্যে বা নঞর্থককে অস্ত্যর্থক বাক্যে বদলানো যায় তা পাশাপাশি তুলনা করে বুঝে নিই। বাঁদিক থেকে

ডানদিকে পড়লে অস্ত্যর্থকগুলো নঞর্থক হচ্ছে, আবার ডানদিক থেকে বাঁদিকে পড়লে পাবো উলটোটা :

অস্ত্যর্থক বাক্য	নঞর্থক বাক্য
খেয়ে দেয়ে আজ আমার প্রচুর কাজ আছে।	খেয়ে দেয়ে আজ আমার কাজ নেহাত কম নেই।
এই অপমানের পর এক্ষুনি চলে যেতে চাই।	এই অপমানের পর আর থাকতে চাই না।
জেনেশুনে এমন পাপ করা অসম্ভব।	জেনেশুনে এমন পাপ করা সম্ভব নয়।
গতকাল রাতে সে বাড়ির বাইরে ছিল।	গতকাল রাতে সে বাড়ি ফেরেনি।

অস্ত্যর্থক বাক্য	নঞর্থক বাক্য
মাথা ঠান্ডা থাকলে সব ঠিক থাকে।	মাথা গরম হলে কিছুই ঠিক থাকে না।
ঠিক প্রশ্নটার ভুল উত্তর দিল।	ঠিক প্রশ্নটার ঠিক উত্তর দিতে পারল না।
সূর্য চিরটাকাল পূর্ব দিকেই ওঠে।	সূর্য কোনো কালেই পশ্চিম দিকে ওঠেনি।
রাহুলের দাদার নাম সৌরভ ছাড়া অন্য কিছু।	রাহুলের দাদার নাম সৌরভ নয়।

সাধারণভাবে অস্ত্যর্থক বাক্যের কোনো একটা শব্দ বা ভাবকে বিপরীত করে তার সঙ্গে আবার কোনো না বাচক শব্দ জুড়লে সেটা একই অর্থবোধক নঞর্থক বাক্য হয়ে থাকে। এর উলটোটা করলে নঞর্থক বাক্য অস্ত্যর্থক হয়। অনেক ক্ষেত্রেই ক্রিয়াপদকে না বাচক করা হয় আর বৈশিষ্ট্যবাচক শব্দকে বিপরীত অর্থের করে দেওয়া হয়। যেমন :

ভালো	কোনো কাজ	করে
খারাপ	কোনো কাজ	করে না
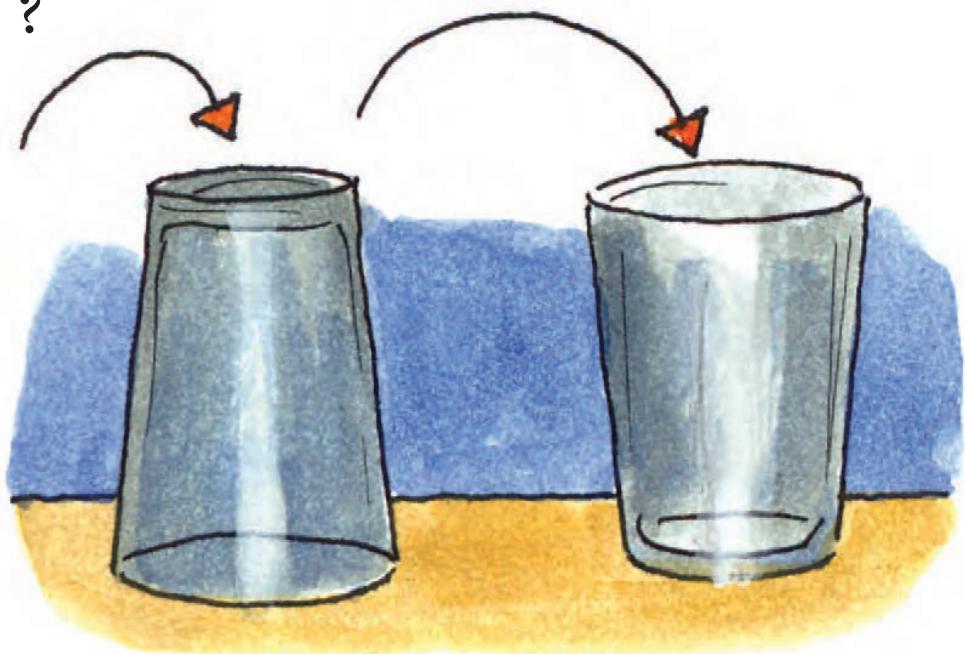
মজাটা দেখো। একটা করে বিপরীতার্থক নিলে অর্থটা সবসময় কেমন উলটে যেত। যেমন :

ভালো **করে** > ভালো **করে না** **ভালো** করে > **খারাপ** করে

খারাপ **করে না** > খারাপ **করে** **খারাপ** করে না > **ভালো** করে না

কিন্তু যেহেতু দুটোকে উলটে দেওয়া হলো তাই সেটা শেষ পর্যন্ত সোজা হয়ে গেল। ধর একটা গেলাস উলটে দিলে সেটা হলো উলটো গেলাস। কিন্তু উলটানোটাকে যদি আবার উলটোও, তাহলে শেষে তো সোজাই হয়ে যাবে — তাই না?

অস্ত্যর্থক আর নঞর্থক বাক্যের মধ্যে এই সোজা-উলটোর খেলাটা সবসময় চলে। ধরো যে বাক্যে ক্রিয়াপদকে উলটানো যাচ্ছে সহজেই না বাচক শব্দ দিয়ে; কিন্তু যে বাক্যে উলটানোর

মতো আরেকটা কোনো শব্দ পাচ্ছ না, তখন কী করা যায়? তখন দেখা যায় যে, দু-বার না বাচক ব্যবহার করে সেটাকে উলটানো হয়। যেমন :

আমি পারি > আমি পারি না এমন নয়

গেলে পরে পাবে > না গেলে পরে পাবে না

মনে সন্দেহ ছিল > মনে সন্দেহ ছিল না তা নয়

হাতেকলমে

১.নীচের ছোটো বাক্যগুলিকে সম্প্রসারিত করো :

১.১ একটা গল্পের মধ্যে অনেক ঘটনা থাকে।

১.২ পাহাড়ের বরফ গলে নদীতে জল বাড়ছে।

১.৩ এপারে গঙ্গা আর ওপারে পদ্মা নদী।

১.৪ শীতকালে মরশুমি ফুলের মেলা বসে।

১.৫ আমাদের স্কুলবাড়ি নতুন রং করা হলো।

২.পাঁচটি করে বাক্য তৈরি করো :

২.১ কর্তাযুক্ত ও ক্রিয়াযুক্ত সরলবাক্য

২.২ কর্তাযুক্ত ও ক্রিয়াহীন সরলবাক্য

২.৩ কর্তাহীন ও ক্রিয়াযুক্ত সরলবাক্য

৩.নীচের সরলবাক্য দুটির জোড়কে প্রথমে যৌগিক ও পরে জটিল বাক্যে রূপান্তরিত করো :

৩.১ উত্তর দিক থেকে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া বইছে।

সবাই শুকনো ডালপালা জ্বালিয়ে আগুন পোহাচ্ছে।

৩.২ দিনরাত এক করে সবাই খাটছে।

আগামী সপ্তাহে নতুন রাস্তা তৈরি হয়ে যাবে।

৩.৩ কালই গাছের ডালগুলি খালি ছিল।

আজই ডালগুলি ফুলে ফুলে ভরে গেছে।

৩.৪ নদীর ঘাটের কাছে নৌকা বাঁধা আছে।

ঘাটে স্নান করতে গিয়ে দেখি জলের ঢেউয়ে নৌকাটা দুলছে।

৩.৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক কবিতা রচনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা নাটক আর গল্পগুলিও পড়তে ভালো লাগে।

৪.নির্দেশ অনুযায়ী নীচের বাক্যগুলিকে রূপান্তরিত করো :

৪.১ সেদিনের খেলা শেষ হলো এবং সবাই খুশিমনে বাড়ি ফিরল। (সরল বাক্যে)

৪.২ আমরা ছবি আঁকতে আঁকতে গান শুনছিলাম। (যৌগিক বাক্যে)

৪.৩ গ্রামের যে দিকে নদী রয়েছে সে দিকেই জমিদারবাড়িটা। (সরল বাক্যে)

৪.৪ সকলে সাদা খাতা খোলো আর একটা বৃত্ত আঁকো। (সরল বাক্যে)

৪.৫ দিনের বেলা মেলায় গেলেও এখনো ফিরে আসেনি। (জটিল বাক্যে)

৪.৬ যেহেতু প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হলো সেহেতু বাড়ি থেকে বেরোতে পারলাম না। (যৌগিক বাক্যে)

৪.৭ যতদিন সবাই শিক্ষিত না হবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের দুঃখের শেষ নেই। (সরল বাক্যে)

৪.৮ আমি যেতে পারি কিন্তু বেশিক্ষণ বসব না। (জটিল বাক্য)

৫.নির্দেশ অনুযায়ী নীচের বাক্যগুলিকে রূপান্তরিত করো :

৫.১ অপ্রীতিকর কাজ করতে কারোরই ভালো লাগে না। (অস্ত্যর্থক বাক্যে)

৫.২ চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছি না। (অস্ত্যর্থক বাক্যে)

৫.৩ তুমি এখন বসে পড়ো। (নঞর্থক বাক্যে)

৫.৪ পড়া শেষ হয়ে গেল বই বন্ধ করো। (নঞর্থক বাক্যে)

৫.৫ এবারে আমের ফলন খারাপ নয়। (অস্ত্যর্থক বাক্যে)

৫.৬ রাতের ট্রেন ধরতে হলে তাড়াতাড়ি করো। (নঞর্থক বাক্যে)

নির্মিতি

প্রথম অধ্যায়

সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ

প্রত্যেক ভাষায় বেশ কিছু শব্দ থাকে যাদের উচ্চারণে বিভেদ নেই, কিন্তু অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরনের শব্দের বানান সামান্য ভিন্ন হয়। ফলে, লিখিত রূপেই এদের প্রভেদ চিহ্নিত করা চলে। সুতরাং সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ বা প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দের পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শব্দের লিখিত রূপের বানান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনিলবাবু তাঁর ভাই সুনীলকে বকাবকি করছিলেন। 'পড়াশুনো নেই, সারা সন্ধে

বসে-বসে টিভি দেখে চলেছ। সামনে পরীক্ষা। দশটা বেজে গেছে, যাও এক্ষুনি **খেতে** যাও!' শুনে ছুটে এলেন অনিলবাবুর বাবা। তিনি বললেন, 'এ কী অনিল! এত রাতে ছেলেটাকে মাঠে যেতে বলছো। বিপদ-আপদ কিছু হলে কে দেখবে?'

সমস্যাটা এক্ষেত্রে ওই সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দের। অনিলবাবু আসলে ভাই-কে নৈশভোজ খেতে পাঠাচ্ছিলেন। তাঁর বাবা ভেবেছেন সুনীলকে চাষের কাজে **ক্ষেতে** পাঠানো হচ্ছে। বিপত্তি সেখানেই।

এ ধরনের বিপত্তি তোমাদের ক্ষেত্রে যাতে না ঘটে সেজন্যই এ ধরনের শব্দগুলিকে সতর্কভাবে চিনে নিতে হবে। সে কারণে একটি এ ধরনের শব্দের তালিকা তাদের অর্থ এবং ব্যবহারসহ নীচে

দেওয়া হলো। এই চর্চায় হয়তো নতুন, অজানা কয়েকটা শব্দও তোমরা জেনে ফেলতে পারবে। নিজেরাও এ ধরনের শব্দের একটা তালিকা বানাতে পারো। যে ক্ষেত্রে শব্দ বা তার অর্থ জানা নেই, সেসব সময়ে ভালো কোনো অভিধান দেখে নিয়ো।

তাহলে শুরু করা যাক —

১. অণু (ক্ষুদ্র) : অণু অণু জল সাগর বানায়।

অনু (পশ্চাৎ) : বুদ্ধদেবের অনুগামীদের বৌদ্ধ বলা হয়।

২. অনুদিত (উদিত না-হওয়া) : তখনো আঁধার রয়েছে, রাত্রি শেষ হয়নি, সূর্য অনুদিত।

অনূদিত (অনুবাদ করা) : কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত বাংলা মহাভারত গ্রন্থটি পড়েছ কি?

৩. আসা (আগমন) : শুধু যাওয়া-আসা, শুধু স্রোতে ভাসা।

আশা (আকাঙ্ক্ষা) : বড়ো আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও।

৪. কটি (কোমর) : রাজপুত্রের কটিতে তলোয়ার, গলায় চন্দ্রহার।

কোটি (শত লক্ষ) : কোটি তারায় আকাশ জুড়ে আলো।

৫. কুল (বংশ) : সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে।

কূল (তট) : ঝড়ে বুঝতে পারিনি কোন কূলে তরী ভেড়ালাম।

৬. দিন (দিবস) : দিনের পরে দিন যে গেল।

দীন (দরিদ্র) : আমি দীন দুঃখী, পথে পথে ঘুরি।

৭. দার (স্ত্রী, পত্নী) : স্ত্রীর মৃত্যুর পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর দার গ্রহণ করেননি।

দ্বার (ফটক, দরজা) : বারবার ধাক্কা দিলাম, তবু দ্বার খুলল না।

৮. সুর (দেবতা) : সুরলোকে বাজে জয়শঙ্খ।

শূর (বীর) : শূরশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ, তাকে পরাস্ত করা কঠিন।

৯. দ্বীপ (জলবেষ্টিত ভূখণ্ড) : দ্বীপে পৌঁছে নবকুমার কাঠ খুঁজতে শুরু করলেন।

দীপ (বাতি) : দীপ নিভে গেছে মম নিশীথসমীরে।

১০. লক্ষ (একশত সহস্র) : সুলতান খুশি হয়ে ফকিরকে লক্ষ মোহর দিলেন।

লক্ষ্য (উদ্দেশ্য) : শিশুকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল কবি হওয়ার।

১১. শ্বশ্রূ (শাশুড়ি) : দীপার শ্বশ্রূ গ্রামের সম্মানিত শিক্ষিকা।

শ্মশ্রু (দাড়ি) : প্রবীরের শ্মশ্রুগুম্ফহীন মুখ দেখলে বয়স বোঝা দুষ্কর।

১২. সর্গ (অধ্যায়) : মেঘনাদবধ কাব্যটি কয়েকটি সর্গে বিভক্ত।

স্বর্গ (বেহেশ্‌ত) : স্বর্গ-নরক এই দুনিয়ায় দেখতে পাবে খুব সহজে।

১৩. নিতি (নিত্য) : তার ঘরে প্রতিবেশীদের নিতি আনাগোনা।

নীতি (আদর্শ) : বিদ্যাসাগরের নীতি ছিল অন্যায়ের বিরোধিতা করা।

১৪. শুল্ক (কর) : নতুন সেতুটি ব্যবহার করার সময় পরিবহন শুল্ক দিতে হয়।

শল্ক (মাছের আঁশ) : কোনো কোনো জীয়ল মাছের শল্ক থাকে না।

১৫. ধনি (সুন্দরী) : চাঁদ বদনী ধনি, নাচো তো দেখি।

ধ্বনি (শব্দ) : দূর থেকে নদীর জলধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।

প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ

এবার আসি, প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দের প্রসঙ্গে। এতক্ষণ হচ্ছিল সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দের কথা। এরপর 'প্রায়' যোগ করার একটা কারণ আছে। বাংলায় এমন অনেক শব্দযুগল

রয়েছে যাদের উচ্চারণ হুবহু এক নয়। সামান্য পার্থক্য রয়েছে। খুব মন দিয়ে খেয়াল করলে উচ্চারণে সেই প্রভেদটুকু বুঝতে পারা যায়। এরা উচ্চারণে বা বানানে নিকটবর্তী হলেও অর্থে কিন্তু অনেকটাই আলাদা। এরকম কয়েকটি শব্দও নীচে তালিকাবদ্ধ করা হলো। এরপর তোমাদের কাজ, এরকম তালিকা নিজেরাই বানাও। আবার মনে করিয়ে দিই, প্রয়োজনে অভিধানের সাহায্য নিতে ভুলো না।

১. কপাল (ললাট): বীরের কপালে জয়তিলক পরিয়ে দাও।

কপোল (গণ্ডদেশ): কপোল ভিজেছে নয়ন বারিতে।

২. মুখ (বদন) : বালিকার মুখটি রহমত বহুক্ষণ ধরে দেখছিল।

মূক (বোবা) : আজ যারা মূক হয়ে অত্যাচার সইছে, কাল তারা প্রতিবাদে মুখর হবে।

৩. প্রকার (ধরন) : পশুরা দুইপ্রকারের হয়, তৃণভোজী আর মাংসাশী।

প্রাকার (প্রাচীর) : দুর্গের চতুর্দিকে প্রাকার, শত্রুসৈন্য ঢুকতে পারে না।

৪. নীপ (কদম্ব) : এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে।

নৃপ (রাজা) : নৃপ মৃগয়ায় মত্ত ছিলেন।

৫. কমল (পদ্ম) : সরোবরে প্রস্ফুটিত কমল দেখে কবির মনে আনন্দের সঞ্চার হলো।

কোমল (নরম) : কোমল ঘাসে পা ফেলে শিশুটি দৌড়াচ্ছে।

হাতে কলমে

১.নীচে লেখা শব্দগুলির অর্থ অনুযায়ী বাক্যরচনা করো :

১.১ গিরিশ (মহাদেব)

গিরীশ (হিমালয়)

১.২ শব (মৃতদেহ)

সব (সমস্ত)

১.৩ শর (বাণ)

স্বর (কণ্ঠধ্বনি)

১.৪ বাণ (তির/শর)

বান (বন্যা)

১.৫ নীর (জল)

নীড় (পাখির বাসা)

১.৬ উপাদান (উপকরণ)

উপাধান (বালিশ)

১.৭ মতি (মনের ইচ্ছা)

মোতি (মুক্তা)

১.৮ শশাঙ্ক (চন্দ্র)

সশঙ্ক (ভয়ার্ত)

১.৯ স্তবক (গুচ্ছ)

স্তাবক (তোষামোদকারী)

১.১০ সাক্ষর (অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন)

স্বাক্ষর ((দস্তখত)

২.নীচে লেখা শব্দযুগলের অর্থ লেখো এবং সার্থক বাক্যরচনা করো :

২.১ পরিচ্ছদ
পরিচ্ছেদ

২.২ চুড়ি
চুরি

২.৩ দ্বৈত
দৈত্য

২.৪ দীপ্ত
দৃপ্ত

২.৫ যজ্ঞ
যোগ্য

২.৬ শান্ত
সান্ত

২.৭ ষড়যন্ত্র
স্বরযন্ত্র

২.৮ হাড়
হার

২.৯ শিকার
স্বীকার

২.১০ গুড়
গূঢ়

দ্বিতীয় অধ্যায়

পদান্তর

বিশেষ্য থেকে বিশেষণ এবং বিশেষণ থেকে বিশেষ্যে পরিবর্তিত করাকেই আমরা **পদান্তর** বা পদান্তরীকরণ বলে থাকি। আমরা জানি কোনো কিছুর নাম বোঝাতে বিশেষ্য পদের ব্যবহার করা হয়। আবার বিশেষণের কাজ হলো বাক্যের বিভিন্ন পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, পরিমাণ বা মাত্রা প্রভৃতিকে বোঝানো বা বিশেষিত করা। এবার কোনো একটিই পদ কোনো বাক্যে কখনও বিশেষ্য বা বিশেষণ কিংবা প্রয়োজনে উভয় রূপেই ব্যবহৃত হতে পারে। আর এই ব্যবহারের নিরিখেই

পদটির প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। একটা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে আর একটু স্পষ্ট করা যাক —

ভাত না হলে ভেতো বাঙালির চলে না।

উপরের বাক্যে লক্ষ করে দেখো ব্যবহারের প্রয়োজনে 'ভাত' পদটিকে 'ভেতো' পদটিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। আসলে আমরা বলার কিংবা লেখার সময় মনের ভাব প্রকাশ করতে শব্দগুলিকে একটু বদলে নিয়ে প্রয়োগ করি। তাই শুধু প্রয়োগ বা ব্যবহার কৌশলের তারতম্যে একটাই পদ কখনও বিশেষ্য আবার কখনও পরিবর্তিত হয়ে বিশেষণে পরিণত হয়। যেমন : বিশেষ্য পদ 'ভাত' পদান্তরিত হয়ে 'ভেতো' হয়েছে। ঠিক একইভাবে যখন বলা হয়— বুনো ফল বনে গিয়ে খেয়ো না। বা বন্যেরা বনে সুন্দর।— এ দুটি বাক্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় 'বুনো'

বা ‘বন্য’ বিশেষণ পদ দুটি পরিবর্তিত হয়ে ‘বন’ হয়েছে। এই বিষয়টিকেই সংক্ষেপে পদান্তর বলা হয়। বাক্যে ব্যবহারের সময় একই শব্দের এমন পরিবর্তিত হওয়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটে চলে। এবার পদান্তরের বিস্তৃত নমুনা দেওয়া যাক। প্রথমে বিশেষ্য থেকে বিশেষণ এবং তারপর বিশেষণ থেকে বিশেষ্য—

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
অংশ	আংশিক	আক্রমণ	আক্রান্ত
অকস্মাৎ	আকস্মিক	আঘাত	আহত
অক্ষর	আক্ষরিক	আচ্ছাদন	আচ্ছাদিত
অগ্নি	আগ্নেয়	আতপ	আতপ্ত
অণু	আণবিক	আদর	আদুরে
অধিকার	অধিকৃত	আদেশ	আদিষ্ট

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
অন্তর	আন্তরিক	আনন্দ	আনন্দিত
অপেক্ষা	আপেক্ষিক	আপ্যায়ন	আপ্যায়িত
অবসাদ	অবসন্ন	আবরণ	আবৃত
অভিনয়	অভিনীত	আমোদ	আমোদিত
অভিযোগ	অভিযুক্ত	আলোক	আলোকিত
অর্থ	আর্থিক	আহার	আহার্য
অলংকার	অলংকৃত	ইচ্ছা	ঐচ্ছিক
অশিক্ষা	অশিক্ষিত	ইহ	ঐহিক
আইন	আইনি	ঈশ্বর	ঐশ্বরিক
আকর্ষণ	আকৃষ্ট	উক্তি	উক্ত
উচ্চারণ	উচ্চার্য	টক	টোকো
উজান	উজানি	ঢাক	ঢাকি
উত্তাপ	উত্তপ্ত	তত্ত্ব	তাত্ত্বিক

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
উদর	ঔদরিক	তন্দ্রা	তন্দ্রালু
ঔদার্য	উদার	তাপ	তপ্ত
কণ্টক	কণ্টকিত	তৈল	তৈলাক্ত
কথা	কথিত	থমথম	থমথমে
কর্ম	কর্মী	দখল	দখলি
কলঙ্ক	কলঙ্কিত	দখিন	দখিনা
কায়েম	কায়েমি	দান	দাতা
কাব্য	কাব্যিক	দেশ	দেশি
কেতাব	কেতাবি	দেহ	দৈহিক
কোণ	কৌণিক	ধান	ধেনো
ক্ষণ	ক্ষণিক	ধ্যান	ধ্যানী
ক্ষয়	ক্ষয়িত	নগর	নাগরিক
খনি	খনিজ	নাম	নামি

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
খেতাব	খেতাবি	নিয়ম	নিয়মিত
খ্যাতি	খ্যাত	নৈকট্য	নিকট
গমন	গম্য	পট	পোটো
গাঁ	গেঁয়ো	পতন	পতিত
গাছ	গেছো	পল্লব	পল্লবিত
গিরি	গৈরিক	পাঠ	পাঠ্য
গ্রন্থন	গ্রন্থিত	প্রকৃতি	প্রাকৃতিক
গ্রাম	গ্রাম্য	বঙ্গ	বঙ্গীয়
ঘুম	ঘুমন্ত	বিভাগ	বিভাগীয়
ঘৃণা	ঘৃণিত	বিশেষণ	বিশেষিত
চরিত্র	চারিত্রিক	মজা	মজাদার
চিন্তা	চিন্তনীয়	মৌন	মৌনী

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
ছন্দ	ছন্দোময়	যুদ্ধ	যোদ্ধা
জগৎ	জাগতিক	রং	রঙিন
জন্ম	জাত	রেখা	রৈখিক
জঙ্গল	জংলি	লড়াই	লড়াকু
জ্ঞান	জ্ঞানী	লোক	লৌকিক
ঝগড়া	ঝগড়ুটে	শরীর	শারীরিক
ঝুল	ঝুলন্ত	শান্তি	শান্ত
শ্রদ্ধা	শ্রদ্ধেয়	সাধন	সাধিত
সংকেত	সাংকেতিক	সূর্য	সৌর
সংক্ষেপ	সংক্ষিপ্ত	হত্যা	হত
সঙ্গ	সঙ্গী	হিম	হিমেল
সমাজ	সামাজিক	হিসাব	হিসাবি
সর্বনাশ	সর্বনেশে	হেমন্ত	হৈমন্তিক

এবার বিশেষণ থেকে বিশেষ্যপদে পদান্তরের দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো :

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
অকর্মণ্য	অকর্মণ্যতা	ক্লান্ত	ক্লান্তি
অকালপক্ক	অকালপক্কতা	খর্ব	খর্বতা
অক্লান্ত	অক্লান্তি	গভীর	গভীরতা
অতিক্রম্য	অতিক্রম	গিন্নি	গিন্নিপনা
অধিক	আধিক্য	শহুরে	শহর
অধীন	অধীনতা	ঘন	ঘনত্ব
অনিচ্ছুক	অনিচ্ছা	চঞ্চল	চাঞ্চল্য
অভিশপ্ত	অভিশাপ	চালাক	চালাকি
আকস্মিক	আকস্মিকতা	চির	চিরত্ব
আকুল	আকুলতা	কবি	কবিত্ব

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
আত্মিক	আত্মা	ছিন্ন	ছিন্নতা
ইচ্ছুক	ইচ্ছা	জটিল	জটিলতা
ইতর	ইতরতা	জাতীয়	জাতীয়তা
উক্ত	উক্তি	ঠিকেদার	ঠিকাদারি
উড়ন্ত	ওড়া	তরল	তারল্য
উদ্ভাবিত	উদ্ভাবন	তাৎক্ষণিক	তাৎক্ষণিকতা
উপলব্ধ	উপলব্ধি	তৃপ্ত	তৃপ্তি
ঋদ্ধ	ঋদ্ধি	দরিদ্র	দারিদ্র্য
এক	ঐক্য	দাস	দাসত্ব
একাগ্র	একাগ্রতা	দীন	দৈন্য
ওস্তাদ	ওস্তাদি	দূর	দূরত্ব
ঔপনিবেশিক	উপনিবেশ	ধর্মীয়	ধর্ম

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
কঠিন	কাঠিন্য	ধূর্ত	ধূর্তামি
কম	কমতি	মগ্ন	মগ্নতা
কুশ্রী	কুশ্রীতা	নেতা	নেতৃত্ব
কোমল	কোমলতা	পছন্দ	পছন্দসই
পটু	পটুত্ব	রোগী	রোগ
পূর্ণ	পূর্ণতা	ললিত	লালিত্য
প্রবল	প্রাবল্য	লৌকিক	লৌকিকতা
ফেনিল	ফেনিলতা	শক্ত	শক্তি
বৎসল	বাৎসল্য	শিশু	শৈশব
বন্দি	বন্দিত্ব	সংগত	সংগতি
ব্যাকুল	ব্যাকুলতা	সফল	সাফল্য

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
ভণ্ড	ভণ্ডামি	সভ্য	সভ্যতা
ভদ্র	ভদ্রতা	সর্দার	সর্দারি
ভ্রান্ত	ভ্রান্তি	সহজ	সহজতা
মলিন	মালিন্য	সুরভি	সৌরভ
মুগ্ধ	মুগ্ধতা	স্বতন্ত্র	স্বাতন্ত্র্য
মিষ্ট	মিষ্টত্ব	হতাশ	হতাশা
যথার্থ	যাথার্থ্য	হীন	হীনতা
যান্ত্রিক	যান্ত্রিকতা	হার্দিক	হৃদয়
রসিক	রসিকতা	হ্রস্ব	হ্রস্বতা

হা
তে
ক
ল
মে

১.নীচের পদগুলির মধ্যে কোনটি বিশেষ্য ও কোনটি বিশেষণ চিহ্নিত করো :

অন্তর, ঐশ্বরিক, কেতাবি, জাত, রং, তৈল, শান্তি, সংক্ষিপ্ত, সর্বনেশে, সৌর।

২.নীচের বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে পরিবর্তিত করো :

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
উক্তি		পতন	
গমন		লোক	
জগৎ		শ্রদ্ধা	
ঝুল		হিম	
তত্ত্ব		সূর্য	

৩.নীচের বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে পরিবর্তিত করো :

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
অক্লান্ত		গ্রামীণ	
অধিক		নেতা	
ওস্তাদ		পূর্ণ	
কোমল		যান্ত্রিক	
জটিল		স্বতন্ত্র	

৪.কী পদ চিহ্নিত করে পদান্তর করো :

জংলি, লোক, এক, তৃপ্ত, খর্বতা, পাঠ, সার্থক, শিষ্য, নূতনত্ব, বড়ো।

৫.পদান্তর করো :
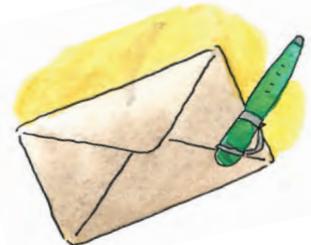
খেলোয়াড়, চক্ষু, জৈব, নির্দেশ, ব্যাহত, অরুণ, ঔদাসীন্য, দুর্গত , বন্ধু, স্বাধীন।

তৃতীয় অধ্যায়

পত্ররচনা

• ব্যক্তিগত / পারিবারিক

নমুনা - এক : কুশল জানিয়ে পিতাকে পুত্রের পত্র

৩/৯, হাজি মহম্মদ মহসিন স্কোয়ার

কলকাতা - ৭০০ ০১৬

০৬.০১.২০১৫

পাকজনাবেষু,

আব্বা, কয়েকদিন হলো তোমাদের কোনো খবর পাচ্ছি না, তাই পড়ার ফাঁকে চিঠি লিখতে বসলাম। আমি এখানে তোমাদের দোয়ায় ভালো

আছি এবং মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করছি। বিদ্যালয়ের সব মাস্টারমশাই খুব যত্ন করে আমাদের পড়ান। বিশেষ করে ইমতিয়াজ মাস্টারমশাই শ্রেণিশিক্ষক হওয়ার সুবাদে আমাদের বন্ধু হয়ে উঠেছেন। তোমাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই। ভাইজান, আম্মা ও তুমি কেমন আছো জানিয়ে চিঠির উত্তর দিও।

আমার আদাব গ্রহণ করবে।

ইতি -

সেলিম

প্রাপক

মহম্মদ কুতুবুদ্দিন

গ্রাম - বেলডাঙা

ডাকঘর - মোল্লার হাট

জেলা - মুরশিদাবাদ

পিনকোড - ৭৪২ ১৩৩

নমুনা - দুই : দিদিকে অভিনন্দন জানিয়ে বোনের চিঠি

গ্রাম - রাজীবপুর,
উত্তর ২৪ পরগনা
১২.০২.২০১৫

প্রিয় সুস্মিতাদি,

সবসময় তোমার পাঠানো চিঠি আমার কাছে আনন্দের বন্যা বয়ে আনে। তুমি বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছ শুনে খুব খুশি হয়েছি। গতবছর ডিসেম্বরে আমাদের বাড়ি এসে তুমি যে গান শুনিয়েছিলে তার স্মৃতি এখনও

অম্লান। মা, বাবাকে তোমার সাফল্যের কথা শুনিয়েছি, তাঁরা তোমাকে আশীর্বাদ জানিয়েছেন। আর তোমার জন্য বাবা উপহার হিসেবে 'কিশোর গল্প সমগ্র' কিনে দেবেন বলেছেন।

আমরা ভালো আছি। চিঠির আশায় রইলাম।

ইতি -

রূপকথা

প্রাপক

সুস্মিতা সান্যাল

গ্রাম - বোলপুর, জেলা - বীরভূম

পিনকোড - ৭৩১ ২০৪

নমুনা - তিন : বাবার কুশল জানতে চেয়ে ছেলের চিঠি

গ্রাম - বাসুদেবপুর,
পশ্চিম মেদিনীপুর
১৭.০২.২০১৫

শ্রীচরণেষু বাবা,

দশদিন হলো আপনার কোনো খবর পাইনি। আমি, মা ও বোন ভালো থাকলেও আপনার জন্য চিন্তায় আছি। ছোটো পিসিমা তিনদিন আগে আমাদের বাড়ি এসেছেন, তুলিও সঙ্গে এসেছে। তিনজনে খুব আনন্দ করছি। অবশ্য আমরা মন দিয়ে পড়াশোনাও করছি। আগামী রবিবার

আমরা পাশের আমবাগানে চড়ুইভাতি করতে যাব, আপনি থাকলে আরো আনন্দ হতো। আমাদের জন্য চিন্তা করবেন না।

আপনি আমার প্রণাম নেবেন। তাড়াতাড়ি চিঠির উত্তর দিয়ে আপনার কুশল জানাবেন।

ইতি -

অর্ক

প্রাপক

শ্রীকুমার দাস

৩৩ সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউ

পার্ক সার্কাস, কলকাতা

পিনকোড-৭০০ ০১৭

নমুনা - চার : সাহসিকতার প্রশংসা করে বন্ধুকে লেখা চিঠি

১১/২ বেলেঘাটা লেন, কলকাতা - ৯

২৩.০২.২০১৫

প্রীতিভাজনেষু সেলভেরিনা,

আজ সংবাদপত্রে তোর ছবি ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা বেরিয়েছে দেখে আমি আনন্দে আটখানা হয়ে একছুটে সবাইকে কাগজটা দেখিয়ে ফেললাম।

বুনো হাতির কবল থেকে দুটি শিশুর প্রাণ বাঁচানোর জন্য তুই যে উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিস তাতে সাহসিকতার দৃষ্টান্তও স্থাপিত হয়েছে। কাগজে পড়লাম মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে দামাল হাতিদের দিকে দোকানে রাখা কলার ছড়া ছুঁড়ে দিয়েছিলি তাই শিশুগুলির দিক থেকে হাতিরা

অন্যদিকে ছুটে গিয়েছিল। তোর মতো বন্ধু পেয়ে আমি গর্বিত, সবাই খুশি।

তোর জন্য ভালোবাসা ও শুভকামনা রইল।
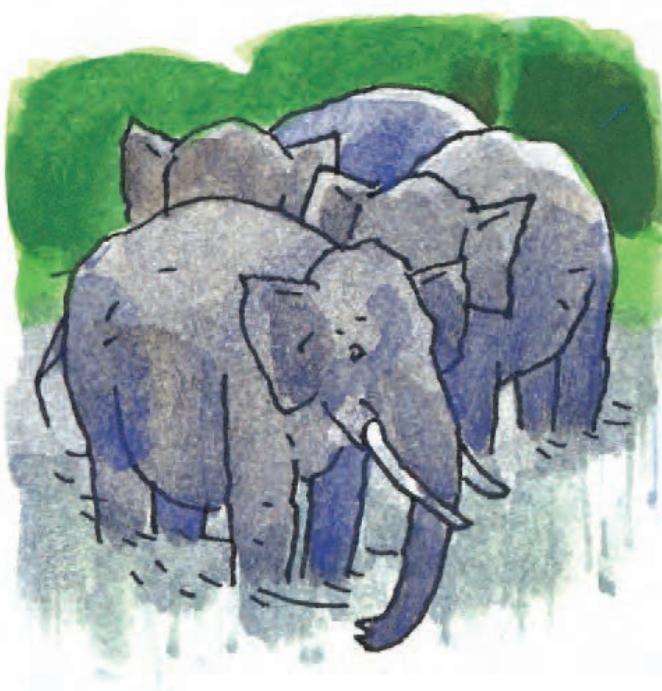
ইতি -

তোরই সৃজনী

প্রাপক

সেলভেরিনা নার্জিনারি
হ্যামিলটন চা বাগান, জেলা - আলিপুরদুয়ার
পিনকোড - ৭৩৬ ১২১

• প্রশাসনিক পত্র

নমুনা - এক : রাস্তা সংস্কারের আবেদন জানিয়ে অঞ্চলপ্রধানের কাছে পত্র

মাননীয় অঞ্চলপ্রধান সমীপেষু
পূর্ব দিনহাটা, ব্লক নং - ১
কোচবিহার

মহাশয়,

আমরা দিনহাটা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। আমাদের গ্রামে কয়েকটি রাস্তার সংস্কার হলেও আমাদের বিদ্যালয়ে আসার প্রধান রাস্তাটি সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। আগে রাস্তাটি যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল। বর্তমানে পণ্যবাহী বিশালকায় গাড়ির চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ায় রাস্তাটি স্থানে স্থানে ভেঙে গেছে। কয়েকটি বড়ো গর্ত

মরণফাঁদের মতো হয়ে উঠেছে। প্রায়ই বিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীরা ছোটোখাটো দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন। রাস্তাটির বেহাল অবস্থার কারণে আমাদের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ভয়ানক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আপনি অনুগ্রহ করে রাস্তাটির সংস্কারসাধনের ব্যবস্থা করলে বিশেষ উপকৃত হব।

বিনীত,

দিনহাটা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ

মধ্যপল্লী, পূর্ব দিনহাটা
২০ জানুয়ারি, ২০১৫

নমুনা - দুই : বিদ্যালয়ে দেয়ালপত্রিকা প্রকাশের অনুমতি চেয়ে পত্র

মাননীয়া প্রধানশিক্ষিকা সমীপেষু,

পার্বতীদেবী উচ্চ বিদ্যালয়

নদিয়া

মহাশয়া,

আমরা আপনার বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ ‘খ’ শ্রেণির ছাত্রী। অন্যান্য শ্রেণির মতো আমরাও একটি দেয়ালপত্রিকা প্রস্তুত করে প্রার্থনাকক্ষের দেয়ালে রাখতে চাই। আমাদের দেয়ালপত্রিকার মূলভাব ‘পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও বনসৃজন’। ছোটো ছোটো লেখা ও ছবির মধ্যে দিয়ে আমরা জানাতে চাই যে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সুস্থ শরীর ও দৃঢ় মানসিকতা গঠনে সহযোগিতা করে। দেশ-বিদেশের সংবাদপত্রের টুকরো খবর কেটে লাগিয়ে আমরা সবাইকে সবুজ অরণ্যের

প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করতে চাই। আশা করি, এই পরিকল্পনাটি রূপায়ণের ক্ষেত্রে আপনার অনুমতি প্রদান করে আমাদের বাধিত করবেন।

নদিয়া

১২ মে, ২০১৫

বিনয়াবনতা,

ষষ্ঠ শ্রেণি 'খ'

শাখার ছাত্রীবৃন্দ

নমুনা - তিন : বিদ্যালয়ের সামনে যান নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুরোধ জানিয়ে প্রশাসনের কাছে পত্র

মাননীয় পরিবহন অধিকর্তা

প্রশাসনিক ভবন, পরিবহন দপ্তর

চাঁপাডালি মোড়

বারাসত

মহাশয়,

আমরা স্থানীয় বারাসত বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। বারাসত অঞ্চলটি জনবহুল এবং প্রতিদিন

এই অঞ্চলের রাস্তা দিয়ে প্রচুর যানবাহন চলাচল করে। সকাল দশটা থেকে যানবাহনের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, ফলে আমাদের বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তায় ভয়ানক যানজটের সৃষ্টি হয়। একই অবস্থা হয় বিকালে বিদ্যালয় ছুটির পর। বিপজ্জনক গতিতে বড়ো গাড়িগুলি চলার ফলে আমাদের সাইকেল চালাতেও অসুবিধা হয়। কখনো-কখনো দুর্ঘটনাও ঘটে। আপনি যদি অনুগ্রহ করে এই অঞ্চলের যানবাহন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন তাহলে অশেষ উপকৃত হব।

বারাসত
১৯ জানুয়ারি, ২০১৫

নমস্কারান্তে,
বারাসত বালিকা
বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ

হাতেকলমে

• নিম্নলিখিত বিষয় অবলম্বন করে অনধিক ৮০ শব্দে পত্ররচনা করো :

১. বার্ষিক পরীক্ষার ফল জানিয়ে পিতার কাছে পুত্রের পত্র।

২. আবাসিক বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা জানিয়ে দাদার কাছে ভাইয়ের পত্র।

৩. জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বন্ধুর সাফল্যে খুশি হয়ে বন্ধুর অভিনন্দন পত্র।

৪. প্রথম সমুদ্র দর্শনের অভিজ্ঞতা জানিয়ে বন্ধুর কাছে পত্র।

৫. প্রবাসী বন্ধুকে গ্রামের নবান্ন উৎসবে আমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুর পত্র।

৬. শীতের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে বনভোজনের আমন্ত্রণ জানিয়ে শহরবাসী দাদার কাছে বোনের পত্র।

৭. শিক্ষামূলক ভ্রমণে ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করে অভিজ্ঞতা জানিয়ে আবাসিক বিদ্যালয় থেকে দিদির কাছে ভাইয়ের পত্র।

৮. বিদ্যালয় সংলগ্ন অঞ্চলে শব্দদূষণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণের আবেদন জানিয়ে পরিবহন দপ্তরে পত্র।

৯. বিদ্যালয়ের প্রার্থনাকক্ষে সাহিত্যসভার আয়োজন করার অনুমতি চেয়ে পত্র।

১০. বিদ্যালয়ের সামনে কাটা ফল বিক্রি বন্ধের অনুরোধ জানিয়ে প্রশাসনের কাছে পত্র।
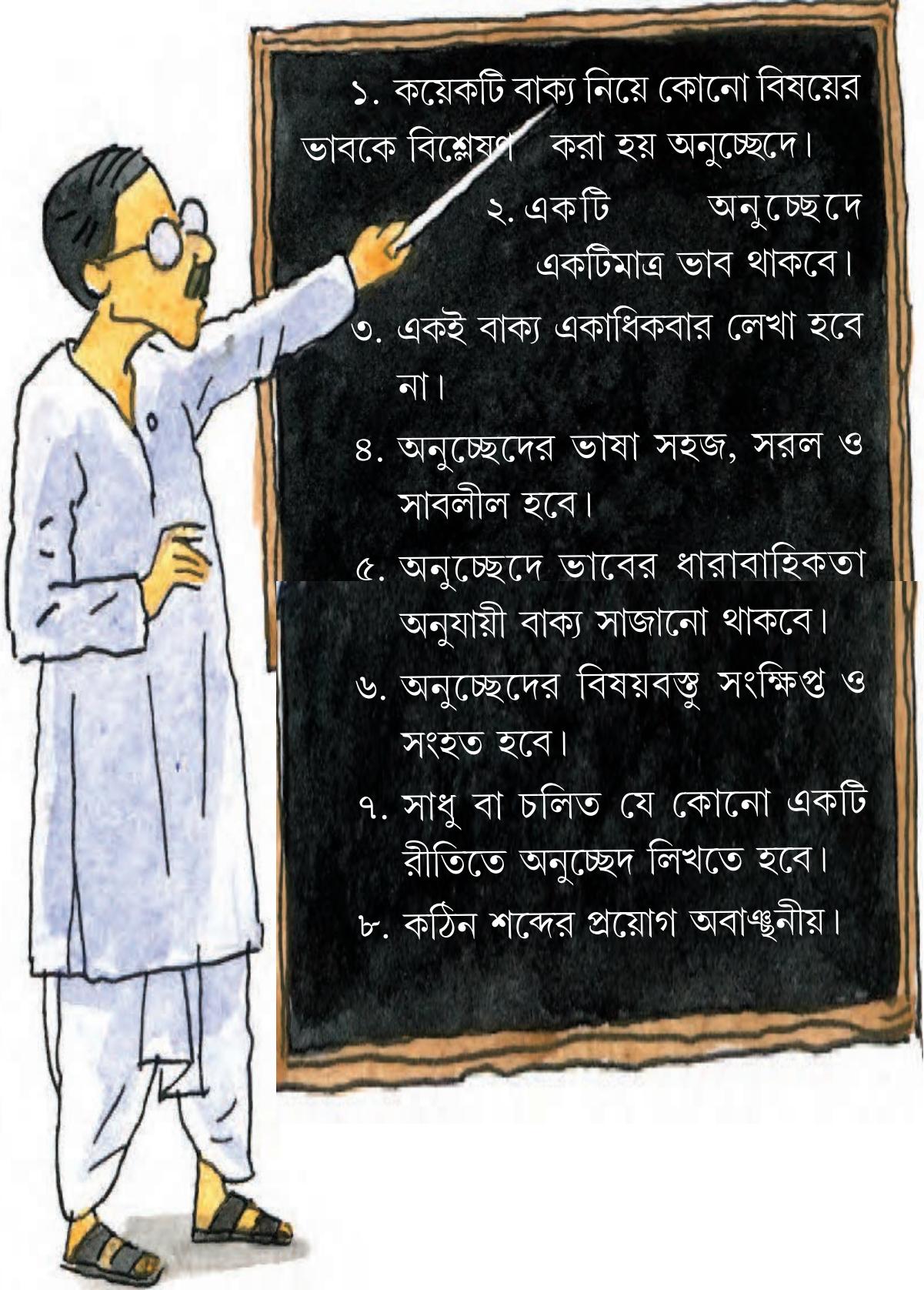
চতুর্থ অধ্যায়

অনুচ্ছেদ রচনা

ঋতু, দৈনন্দিন জীবন, উদ্ভিদ; প্রাণীজগৎ, মানবহৃদয়ের ভাবনার বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে অনুচ্ছেদ রচিত হতে পারে। অনুচ্ছেদ রচনার মাধ্যমে লেখার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অনুচ্ছেদ রচনার ক্ষেত্রে কয়েকটি রীতির দিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন।

১. কয়েকটি বাক্য নিয়ে কোনো বিষয়ের ভাবকে বিশ্লেষণ করা হয় অনুচ্ছেদে।
২. একটি অনুচ্ছেদে একটিমাত্র ভাব থাকবে।
৩. একই বাক্য একাধিকবার লেখা হবে না।
৪. অনুচ্ছেদের ভাষা সহজ, সরল ও সাবলীল হবে।
৫. অনুচ্ছেদে ভাবের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী বাক্য সাজানো থাকবে।
৬. অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত ও সংহত হবে।
৭. সাধু বা চলিত যে কোনো একটি রীতিতে অনুচ্ছেদ লিখতে হবে।
৮. কঠিন শব্দের প্রয়োগ অবাঞ্ছনীয়।

এই অধ্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ের কয়েকটি অনুচ্ছেদের দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া হলো।

ঋতু বিষয়ক

বর্ষণমুখর বাংলা

দেবদিবাকরের দাবদাহে প্রকৃতি যখন শ্রান্ত তখনই আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে নীল আকাশ ঘন

কালো মেঘে ঢেকে বর্ষাসুন্দরী আসে। মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের ঝলকানি আর অবিরাম বারিধারায় বর্ষার শুভাগমন ঘটে বাংলার বুকে। বর্ষার জলধারা পৃথিবীর শুষ্ক মাটিকে সরস করে তার বুকে সবুজের কোমল আবরণ এনে দেয়। তৃষ্ণার্ত অরণ্য নবীনধারায় স্নান করে সজীব হয়ে ওঠে। হাসিমুখে বাংলার কৃষক মাঠে মাঠে বীজ বোনে, চারা রোপণ করে। দিকে দিকে ফুটে ওঠে গাঁদা, বকুল, কদম। শস্যশ্যামলা ধরিত্রীর বুকে সাধারণ মানুষও স্বস্তি পায়। অন্যদিকে, বর্ষায় অতিবৃষ্টির ফলে বন্যার সৃষ্টি হয়ে ফসল নষ্ট হয়। বর্ষার জল জমে শহরেও দুর্দশা দেখা দেয়। তবে এই বর্ষাতেই ভোজনরসিক বাঙালি 'ইলিশ উৎসবে' মেতে ওঠে।
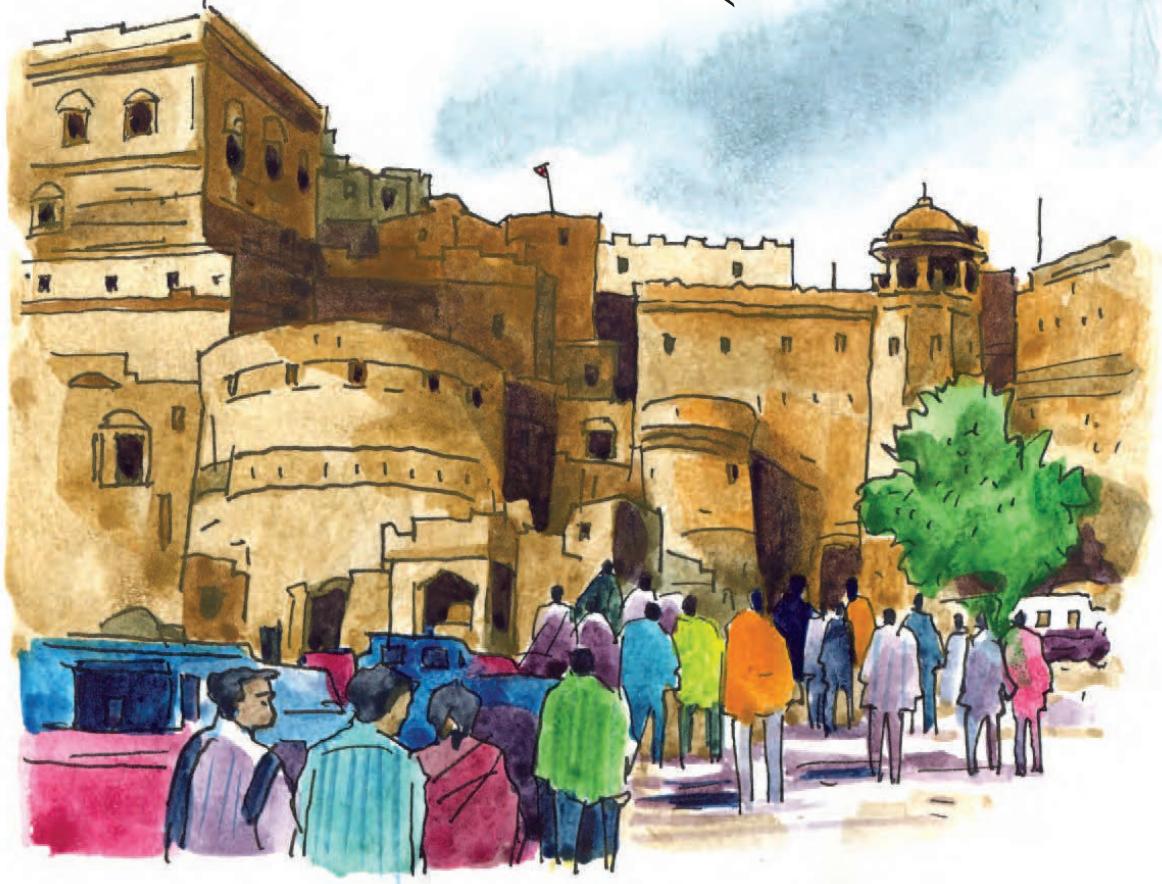
ঋতুরাজ বসন্ত

নতুন পাতার সমারোহে, আম্রমুকুলের গন্ধে, কোকিলের কুহুতানে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে আসে ‘ঋতুরাজ’ বসন্ত। ঋতুর পালাবদলে অশোক, পলাশ, শিমূল ও কৃষ্ণচূড়ার রক্তরাগের নেশায়

প্রকৃতি মেতে ওঠে রূপের খেলায়। বসন্তে ফুল-ফল-সবজির বাহার, রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ার কারণে রবিশস্যের জোগান পর্যাপ্ত থাকে। অতীতে বসন্তকালে জলবসন্ত ও গুটিবসন্ত রোগের প্রকোপ থাকলেও, বর্তমানে তা আর নেই। বসন্তের দোল উৎসবে রঙিন আবির ও সুগন্ধি ফাগে ভরে ওঠে বাতাস। মঠ, ফুটকড়াই, পিচকারি, জরিদার টুপি এবং অজস্র রঙে ভারতবাসীর 'হোরিখেলা' প্রকৃতপক্ষে সম্প্রীতির উৎসব। রূপবৈচিত্র্যের কারণে বসন্ত ঋতু চিরদিনই কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের হৃদয় হরণ করে নেয়। বসন্তের বিদায়ের মধ্যে দিয়েই বাংলার জনসাধারণ পুরানো বছরকে পার করে বর্ষবরণের জন্য প্রস্তুত হয়।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতামূলক

সোনার কেল্লা-র স্মৃতি

বাৎসরিক পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হওয়ায় মা-বাবা উপহারস্বরূপ আমাকে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন জয়সলমিরের সোনার কেল্লার সামনে। সৌন্দর্যে দিশাহারা আমি এক দৌড়ে কেল্লার ভিতরে, সেখানে অলিগলিতে পাথরের

অট্টালিকায় ঘুমিয়ে আছে ইতিহাস। হলুদ পাথরের কারুকার্যে অসামান্য, অবিশ্বাস্য দক্ষতার ছাপ। কেল্লার নির্জন ঘরে দাঁড়িয়ে মনে হলো এখনই শুরু হবে ‘হোরি উৎসব’। স্মৃতির পাতায় ঘুমিয়ে থাকা রাজপুত-রাজপুতানি এখনই জেগে উঠবে। জনহীন মরুভূমি, কাঁটাগাছের নিঃসঙ্গতা, উটের পিঠে চড়ার অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা কেবলই ‘জটায়ু’-কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। প্রতিমুহূর্তে বাতাসে ভেসে আসছে রাজপুতদের বীরত্বের গাথা, স্থানীয় লোকসংগীত শিল্পীরা শোনাচ্ছেন রাজপুত ললনাদের সাহস এবং আত্মত্যাগের অনন্যসাধারণ কাহিনি। রাজভূমির সৌন্দর্য, বীরত্ব ও আত্মবলিদানের কাছে পরম শ্রদ্ধায় মাথা নত করলাম।

গ্রীষ্মের একটি দুপুর

লালমাটির দেশ বীরভূমের এক আবাসিক বিদ্যালয়ে এসেছি মাসখানেক আগে, গ্রীষ্মের রবিবারের নির্জন দুপুরে ছাত্রাবাস প্রায় নিঃস্তব্ধ। ঘর থেকে বেরিয়ে বসলাম খোলা বারান্দায়।

রঙিন বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা ঝকঝকে উঠান পার করলেই আঁকাবাঁকা লালমাটির পথ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। মনে পড়ছে গ্রামের বাড়িতে স্তব্ধ দুপুরে মা-ঠাকুমার বিশ্রামের সুযোগে লুকিয়ে আচার খাওয়া, কিংবা নদীর শীতল জলে সমবয়সিদের সঙ্গে ঝাঁপাঝাঁপি। হঠাৎ করে স্মৃতির আবেশ কেটে কানে এল মিষ্টি সুর, দেখলাম সাঁওতাল কিশোর মাটি কাটার কাজ শেষে আপনমনে বাঁশি বাজিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে রাঙাপথ। প্রকৃতির সন্তান খররৌদ্রে পথের ক্লান্তি বাঁশির সুরে মিলিয়ে দিয়েছে। ছোট্ট এই স্মৃতিকে ডায়েরির বুকে তুলে রাখতে কলম নিয়ে বসলাম।

জীবনী বিষয়ক

মীর মশাররফ হোসেন

১৮৪৭ সালের ১৩ নভেম্বর বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন মীর মশাররফ হোসেন। পিতা মীর মুয়াজ্জম হোসেন এবং মাতা দৌলতন্নেসা। ছেলেবেলা থেকেই সাহিত্যানুরাগী মশাররফ হোসেন যৌবনে প্রগতিশীল লেখক হয়ে ওঠেন। কবি ঈশ্বর গুপ্তের ‘সংবাদ প্রভাকর’-এ তিনি নিয়মিত সাংবাদিকতা করতেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যুক্ত থেকে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ-সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। কারবালার প্রান্তরে হাসান-হোসেনের মহান আত্মত্যাগের কাহিনি নিয়ে রচিত তাঁর

‘বিষাদসিন্ধু’ সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। রত্নাবতী, গৌরীসেতু, বসন্তকুমারী, উদাসীন পথিকের মনের কথা ইত্যাদি তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ। ‘আমার জীবনী’ নামক আত্মজীবনীতে আছে বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। তিনি ‘আজীজন নেহার’ নামে মাসিক পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন। ১৯১১ সালের ১৯ ডিসেম্বর এই প্রথিতযশা সাহিত্যিকের জীবনাবসান হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি উত্তর কলকাতার সিমলা অঞ্চলে বিখ্যাত দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নরেন্দ্রনাথ । পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ও মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী আদর করে ‘বিলে’ বলে ডাকতেন। দুরন্ত বিলে শৈশব থেকেই নির্ভীক, সত্যবাদী এবং সহানুভূতিশীল। তিনি মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন এবং স্কটিশচার্চ

কলেজ থেকে শিক্ষালাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নরেন্দ্রনাথ 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে পরিচিত হন। পরিব্রাজকরূপে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে তিনি স্বদেশবাসীর অবর্ণনীয় দুর্দশা প্রত্যক্ষ করেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে ভারতবর্ষের মহান ঐতিহ্য এবং সনাতন আদর্শের কথা প্রচার করে স্বদেশকে

গৌরবান্বিত করেন। তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থগুলি হলো বর্তমান ভারত, পরিব্রাজক ইত্যাদি। তিনি বেলুড়ে ‘রামকৃষ্ণ মিশন’ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে বীরসন্ন্যাসী অমৃতধামে যাত্রা করেন।

বিদ্যালয় জীবন বিষয়ক

বিদ্যালয়ে কুইজ

আমাদের বাসুদেবপুর বিদ্যাপীঠে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি বিভিন্ন বই পড়ানো হয়। এভাবে বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার বাইরেও আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। প্রতি মাসের শেষ শনিবার তৃতীয় ও চতুর্থ পিরিয়ডে আমাদের শ্রেণিতে কুইজ বা প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতার

আয়োজন করা হয়। সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, খেলাধুলা এবং সাধারণজ্ঞানকে ভিত্তি করে প্রশ্নোত্তর পর্ব চলে। সাধারণত সমসংখ্যক ছাত্র নিয়ে গঠিত দুটি দলে এই প্রতিযোগিতা হয়। আমাদের মাস্টারমশাইরা কুইজ মাস্টারের ভূমিকা পালন করেন। প্রশ্নোত্তরকে আকর্ষণীয় করার জন্য ছবি ও গানের মাধ্যমেও প্রশ্ন করা হয়। শেষ শনিবার আমাদের দল এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে। বিদ্যালয় জীবনের এই শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতা আমাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং দলবদ্ধভাবে কাজ করার মানসিকতা গঠনে সহায়তা করে।

আদর্শ বিদ্যালয়

আমাদের আদর্শ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী একসঙ্গে শিক্ষালাভ

করে। আমাদের বিদ্যালয় গাছের ছায়ায় ঘেরা মনোরম পরিবেশ গড়ে উঠেছে। একহাজার ছাত্রছাত্রী সেই শান্ত, নির্জন প্রকৃতির কোলে নিয়মিত বিদ্যার্জন করে। বিদ্যালয়ে সহশিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা বাইশ, আমাদের তাঁরা সযত্নে শিক্ষা দেন। এছাড়া রয়েছেন স্নেহময়ী প্রধানা শিক্ষিকা। বিদ্যালয় ও ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক বিকাশসাধনই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। শিক্ষা, খেলাধুলা ও সংস্কৃতির জগতে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। তবে আমাদের বিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মিলনমেলায়। বিদ্যালয়ের সবুজ মাঠে প্রতি বছর ১ বৈশাখে একটি মেলা বসে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে স্থানীয় মানুষ এই মিলনমেলায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। বিদ্যালয় জীবনেই আমরা ভারতবর্ষের ‘বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য’-র সত্যতা উপলব্ধি করছি।

হাতে কলমে

● **নিম্নলিখিত বিষয় অবলম্বন করে অনধিক ১০০ শব্দে অনুচ্ছেদ রচনা করো :**

১.রুদ্রতাপস গ্রীষ্ম

(সূত্র : সময়কাল — প্রখর দাবদাহ — ফুল ও ফল — সুবিধা ও অসুবিধা — বৈশিষ্ট্য)

২.উৎসবমুখর শরৎ

(সূত্র : আকাশে পালকের মতো সাদা মেঘ --- কাশের সমারোহ --- দুর্গাপূজা, ইদ, দীপাবলির উৎসব — শরৎকালীন উৎসবে সম্প্রীতির রূপ)

৩.হিমেল শীত

(সূত্র : প্রকৃতির রূপ — ফুল, ফল, সবজির সমারোহ — নতুন গুড়, পিঠে, পায়েস — বনভোজনের আনন্দ — পৌষ মেলা)

৪.বর্ষণমুখর একটি রাত

(সূত্র : কালো মেঘ ভেঙে অবিরাম বর্ষণ — স্মৃতিমেদুরতা — প্রকৃতির অপূর্ব রূপ দর্শন — বিনিদ্র রাত্রি)

৫.শীতের একটি দিন

(সূত্র : কুয়াশার চাদরে ঢাকা দিনের প্রথমভাগ — বেলার দিকে মিঠেকড়া রোদ — পাশের আমবাগানে চড়ুইভাতি — ছোটোদের সঙ্গে বড়োদেরও অবাধ আনন্দ)

৬.বইমেলায় একদিন

(সূত্র : অজস্র বই দেখে বিস্ময় — নতুন বইয়ের গন্ধ— মনের মতো বই কেনা — ফেরার সময় মনখারাপ— সব বই দেখা হলো না)

৭.মাদার টেরেজা

(সূত্র : পারিবারিক পরিচয় — ত্যাগের আদর্শে দীক্ষা — ভারতবর্ষে আগমন — দুঃখী মানুষের সেবায় আত্মোৎসর্গ — নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি — তিরোধান)

৮.জগদীশচন্দ্র বসু

(সূত্র : পরিচিতি --- বিজ্ঞান সাধনায় মনোনিবেশ — বিভিন্ন আবিষ্কার — বিশ্বে সমাদর ও সম্মান লাভ — বিজ্ঞানসাধনায় অনন্যতা — তিরোধান)

৯.বিদ্যালয়ে প্রথম দিন

(সূত্র : বিদ্যালয়ের নাম — প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা — অক্ষয় স্মৃতি)

১০. বিদ্যালয়ে পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন

(সূত্র : প্রেক্ষাপট — আয়োজিত অনুষ্ঠান — বৃক্ষরোপণ — পোস্টার প্রতিযোগিতা — পুরস্কার প্রদান — শপথ গ্রহণ)

পঞ্চম অধ্যায়

বোধ পরীক্ষণ

বোধ পরীক্ষণ হলো আমাদের বোধগম্যতার মূল্যায়ন। আমরা কবিতা বা গদ্য যা পড়ি, তা কতটা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছি বোধ পরীক্ষণের মাধ্যমে তারই মূল্যায়ন হয়। যে অংশটি পড়ছি তার বিষয়গত কিংবা ভাষাগত জটিলতা, অপরিচিত শব্দ, উপমা বা উদ্ধৃতির

ব্যবহার প্রভৃতি ছোটোখাটো অসুবিধা ও সমস্যাকে ডিঙিয়ে; পাঠ্যাংশটিকে আমাদের যথার্থভাবে বুঝতে হয়। বোধ পরীক্ষণের মাধ্যমে এই বিভিন্ন দক্ষতা যাচাই করার ফলে, যতটুকু পড়া হলো তা কতটা বোঝা গেল এবং বুঝে নানা সমস্যার নিরিখে সেটুকু প্রকাশ করা গেল কিনা তা সহজেই নির্ণয় করা যায়। 'বোধ পরীক্ষণ' আর 'Comprehension' শব্দ দুটির অর্থ প্রায় একই। 'Comprehension' শব্দটির বাংলা তরজমা করলে দাঁড়ায় কোনো বিষয়কে সামগ্রিকভাবে বোঝার বা উপলব্ধির ক্ষমতা। কোনো একটি রচনাংশ পড়ে তার বিষয়গত এবং ভাষাগত বিভিন্ন দিক নিজের কাছে কতটা স্পষ্ট হলো, বোধ পরীক্ষণের মাধ্যমে তা-ই দেখা হয়। এ যেন নিজের কাছে নিজেরই মূল্যায়ন।

এবার ‘বোধ পরীক্ষণ’- এর ব্যবহারিক আলোচনায় আসা যাক, অর্থাৎ কীভাবে বোধ পরীক্ষণ করা হবে। এক্ষেত্রে কোনো একটি গদ্য বা কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হয়। তারপর সেই অনুচ্ছেদ বা কবিতা -নির্ভর নানা প্রশ্ন, ব্যাকরণগত এবং ভাষাগত বিভিন্ন দক্ষতা ও অর্জিত সামর্থ্যের চর্চার জন্য নানা ধরনের হাতেকলমে কাজ করতে দেওয়া হয়। মনে রাখতে হবে অনেক প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত রচনাংশটির মধ্যেই আছে। তাই খুব মন দিয়ে ওই অংশটুকু পড়ে নেওয়া প্রয়োজন। তারপর প্রশ্ন অনুসারে একে একে উত্তর খোঁজার এবং উত্তর লেখার পালা। চলো প্রথমে কয়েকটি নমুনা দেখে নেওয়া যাক —

নমুনা—এক :

● **নীচের অনুচ্ছেদটি মনোযোগ দিয়ে পড়ে প্রশ্ন-অনুসারে উত্তর দাও :**

প্রাণীবিজ্ঞানী প্রফেসার নবগোপাল ঘোষকে পাখিতে পেয়েছে। পাখি নিঃসন্দেহে জীবজগতের এক অভিনব সৃষ্টি। বিচিত্র তাদের পালকের রং, আচার-আচরণ, আকৃতি। কোনো কোনো পাখির ডাক কী মধুর। সৃষ্টির আদিমকালে কী আশ্চর্য কৌশলে সরীসৃপ থেকে বিবর্তনের ফলে এই খেচর গোষ্ঠীর উদ্ভব। শুধু ভারতবর্ষে আছে পঁচাত্তরটি পক্ষীপরিবার। তাদের প্রায় বারোশো গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়। এবং তাদের মধ্যে তিনশোরকম পাখি যাযাবর — বিদেশ থেকে উড়ে আসে এখানে শীত কাটাতে।

১.নিম্নলিখিত কোন বিকল্পটি ঠিক চিহ্নিত করো :

১.১ সরীসৃপ থেকে বিবর্তনের ফলে উদ্ভব হয়েছে —

(ক) জলচরের (খ) খেচর গোষ্ঠীর

(গ) স্তন্যপায়ীর (ঘ) কোনোটিই নয়।

১.২ যাযাবর পাখিদের গোষ্ঠীর সংখ্যা —

(ক) একশো (খ) তিনশো

(গ) চারশো (ঘ) পঞ্চাশ

২.নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রতিশব্দ অনুচ্ছেদ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :

২.১ বিহঙ্গ ২.২ বর্ণ ২.৩ ভিনদেশ

২.৪ চেহারা ২.৫ অপূর্ব

৩. ‘বিদেশ থেকে উড়ে আসে এখানে শীত কাটাতে।’--- এই বাক্যে কোন শব্দটি উপসর্গ-যোগে গঠিত।

৪. ‘তাদের মধ্যে তিনশোরকম পাখি যাযাবর।’ — ‘তিনশো’-র তিন হলো যৌগিক শব্দের উদাহরণ। — এই বাক্যটি ঠিক না ভুল লেখো।

৫.নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর লেখো :

৫.১ প্রফেসার নবগোপাল ঘোষ কী ছিলেন?

৫.২ খেচর বলতে কী বোঝো?

৫.৩ সংখ্যাবাচক শব্দ আছে, এমন একটি বাক্য অনুচ্ছেদ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো।

৫.৪ কারা বিদেশ থেকে কেন উড়ে আসে?

৫.৫ আমাদের দেশে কয়টি পক্ষীপরিবার আছে?

৬. পাখি নিঃসন্দেহে জীবজগতের এক অভিনব সৃষ্টি। — (এই বাক্যটিকে না-বাচক বাক্যে বদলে লেখো।)

৭. নীচের ছকটি পূরণ করো :

৭.১ আমার প্রিয় পাখির নাম —————— (নাম লেখো।)

৭.২ আমি প্রায়ই দেখি ————————— (কোথায় ?)

৭.৩ দেখতে কেমন --- --- --- --- --- --- --- (চেহারার বিবরণ।)

৭.৪ বিশেষত্ব —————————— (গুরুত্বপূর্ণ দিক)

৭.৫ প্রিয় হওয়ার কারণ ——————————
(কেন প্রিয়?)

উত্তর :

১.১ (খ)   ১.২ (খ)

২.১ পাখি   ২.২ রং   ২.৩ বিদেশ

২.৪ আকৃতি   ২.৫ অভিনব

৩. 'বিদেশ' শব্দটি উপসর্গ যোগে গঠিত —
বি-দেশ

৪. এই বাক্যটি ভুল। 'তিন' হলো মৌলিক শব্দ।

৫.১ প্রফেসার নবগোপাল ঘোষ ছিলেন প্রাণীবিজ্ঞানী।

৫.২ আকাশে গমন করে যে তাকে খেচর বলে, এখানে পাখিরা উড়তে পারে বলে তাদের খেচর বলা হয়েছে।

৫.৩ ‘তাদের প্রায় বারোশো গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়।’ — এই বাক্যে বারোশো হলো সংখ্যাবাচক শব্দ।

৫.৪ যাযাবর পাখিরা নিজেদের দেশের তীব্র শীতের হাত থেকে বাঁচতে অপেক্ষাকৃত অল্প শীতযুক্ত আমাদের দেশে অর্থাৎ ভারতে আসে।

৫.৫ আমাদের দেশে পচাঁত্তরটি পক্ষীপরিবার আছে।

৬. পাখি জীবজগতের এক অভিনব সৃষ্টি এতে সন্দেহ নেই।

৭. সাহিত্য মেলা (ষষ্ঠ শ্রেণি) বইয়ে এধরনের কাজ ‘হাতকলমে’ অংশে আছে। তাই নতুন করে নমুনা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

নমুনা — দুই :

● নীচের অনুচ্ছেদটি মনোযোগ দিয়ে পড়ে প্রশ্ন-অনুসারে উত্তর দাও :

পূজাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলেছে। ১৪ নভেম্বর (১৯১৩) সন্ধ্যায় খবর এল রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের জন্য ‘নোবেল প্রাইজ’ পেয়েছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে সুইডেনের বিখ্যাত শিল্পপতি আলফ্রেড নোবেল কয়েক কোটি টাকা সুইডিশ অ্যাকাডেমির হাতে দিয়ে বলেছিলেন, ওই টাকার সুদ থেকে সাহিত্য-বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঁচটি বিষয়ে পাঁচটি পুরস্কার যেন যোগ্য ব্যক্তিদের বৎসরে বৎসরে দেওয়া হয়। ১৯০১ সাল থেকে পাঁচটি বিষয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ পাঁচজন ব্যক্তিকে ওই পুরস্কার দেওয়া হয়ে আসছে। প্রাচ্যদেশীয়ের মধ্যে এই পুরস্কার

রবীন্দ্রনাথই প্রথম লাভ করলেন। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য ছিল প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা।

১.নিম্নলিখিত কোন বিকল্পটি ঠিক চিহ্নিত করো :

১.১ যে বিখ্যাত সুইডিশ শিল্পপতি নোবেল পুরস্কার চালু করেছিলেন, তার নাম —

(ক) অ্যালবার্ট নোবেল

(খ) আইজ্যাক নোবেল

(গ) অ্যালফিল্ড নোবেল

(ঘ) আলফ্রেড নোবেল

১.২ রবীন্দ্রনাথ যে শাখায় অবদানের জন্য পুরস্কৃত হয়েছিলেন, তা হলো —

(ক) বিজ্ঞান (খ) দর্শন (গ) সাহিত্য

(ঘ) রসায়ন

২.নিম্নলিখিত পদগুলির যথার্থ পদান্তরিত বিশেষ্যটি অনুচ্ছেদ থেকে খুঁজে বের করে লেখো :

২.১ সাহিত্যিক ২.২ পুরস্কৃত ২.৩ সান্ধ্য ২.৪ বাৎসরিক ২.৫ প্রাথমিক

৩.১৪ নভেম্বর (১৯১৩) সন্ধ্যায় খবর এল রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের জন্য 'নোবেল প্রাইজ' পেয়েছেন। (এই বাক্যে কোনটি অনুসর্গ চিহ্নিত করো।)

৪.পূজাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলেছে। --- 'পূজাবকাশের' - এই সন্ধিবদ্ধ পদটির সন্ধি বিচ্ছেদ করো।

৫.প্রাচ্যদেশীয়ের মধ্যে এই পুরস্কার রবীন্দ্রনাথই প্রথম লাভ করলেন। (জটিল বাক্যে রূপান্তরিত করো।)

৬.নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর লেখো :

৬.১ নোবেল পুরস্কারের খবর কখন এসেছিল?

৬.২ প্রথম কোন প্রাচ্যদেশীয় নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন?

৭.নোবেল পুরস্কার প্রচলনের নেপথ্য কাহিনিটি নিজের ভাষায় লেখো।

উত্তর :

১.১ (ঘ)   ১.২ (গ)

২.১ সাহিত্য   ২.২ পুরস্কার   ২.৩ সন্ধ্যা   ২.৪ বৎসর   ২.৫ প্রথম।

৩.এই বাক্যে অনুসর্গটি হলো - 'জন্য'।

৪.পূজাবকাশের — পূজা + অবকাশের

৫.প্রাচ্যদেশীয়ের মধ্যে যিনি নোবেল পুরস্কার প্রথম লাভ করেন তিনি রবীন্দ্রনাথ।

৬.১ পূজাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলেছে, এমনই একদিন ১৯১৩ সালের ১৪ নভেম্বর সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির খবর এসেছিল।

৬.২ প্রাচ্যদেশীয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

৭.সুইডেনের বিখ্যাত শিল্পপতি আলফ্রেড নোবেল কয়েক কোটি টাকা সুইডিশ অ্যাকাডেমির হাতে দিয়ে জানিয়েছিলেন যে ওই টাকার সুদ থেকে সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঁচটি বিষয়ে পাঁচটি পুরস্কার, যেন যোগ্য ব্যক্তিদের প্রতি বছর দেওয়া হয় । সেই ১৯০১ সাল থেকে পাঁচটি বিষয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ পাঁচজন ব্যক্তিকে ওই পুরস্কার

দেওয়া হয়ে আসছে। এইভাবে যোগ্য প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিতে নোবেল পুরস্কারের প্রচলন হয়েছিল।

নমুনা — তিন :

● **নীচের অনুচ্ছেদটি মনোযোগ দিয়ে পড়ে প্রশ্ন-অনুসারে উত্তর দাও :**

বাড়িটা বরফের। ঢোকবার রাস্তা হামাগুড়ি দিয়ে, যেমন দক্ষিণ ভারতবর্ষে টোডাদের* বাড়িতে দেখা যায়। একটা বরফের স্ল্যাবে দড়ি বাঁধা থাকে। ভেতরে ঢুকে দড়ি টেনে দিলে ঘরে আর কেউ ঢুকতে পারে না। স্ল্যাবের বাইরের দিকে একটা দড়ি আছে সেটা টানলে দরজা খুলে যায়। বাড়িকে ইগলু* বলে। ইগলুর ওপর বরফের মাঝে একটু ফাঁক রাখা হয়েছে। ভেন্টিলেশনের জন্য। তাছাড়া

দরজা-জানালা নেই। দিনের আলো হলে ভেতরটায় সব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর অন্ধকারে ইগলুর ভেতর অন্ধকার দেখায়। মাছের তেলের আলো মিটিমিটি জ্বলে। ঘরে চারটে বাংক বা বার্থ আছে। বিছানা বলতে কয়েকটা সীলের চামড়া পাতা, সীলের* চামড়া দুটো পিঠোপিঠে সেলাই করে স্লিপিং ব্যাগ করা হয়েছে। তার ভেতর ঢোকবার সময় ঠান্ডা বেশি হলেও একটু পরেই গরম ও আরাম লাগে। ইগলু কথাটার মানে আশ্রয়, আর সত্যিই সেটা তাই।

* টোডা — দক্ষিণ ভারতীয় আদিম জনগোষ্ঠী।

* ইগলু — গ্রিনল্যান্ডের বাসিন্দা এস্কিমোদের বরফের তৈরি বাড়ি হলো ইগলু। (মানচিত্রে গ্রিনল্যান্ডের অবস্থান ও ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে জেনে নাও।)

* সীল — সীল মাছ -এর কথা বলা হয়েছে।

১.নিম্নলিখিত বিকল্পগুলির মধ্যে ঠিক বিকল্পটি চিহ্নিত করো :

১.১ ইগলুর ওপর বরফের মাঝে একটু ফাঁক রাখা হয়েছে, ভেন্টিলেশনের জন্য। — এখানে ভেন্টিলেশন বলতে বোঝানো হয়েছে —

(ক) চলাচলের রাস্তা

(খ) রাস্তা

(গ) আলো-হাওয়া চলাচলের রাস্তা

(ঘ) হাওয়া চলাচলের রাস্তা

১.২ ইগলু কথাটার মানে হলো —

(ক) আশ্রয়   (খ) বাড়ি

(গ) ঘর   (ঘ) বাসা

২.নীচের বাক্যগুলির কোনটি সরল, যৌগিক ও জটিল নির্দেশ করো :

২.১ ঢোকবার রাস্তা হামাগুড়ি দিয়ে, যেমন দক্ষিণ ভারতবর্ষে টোডাদের বাড়িতে দেখা যায়।

২.২ ইগলু কথাটার মানে আশ্রয় আর সত্যিই সেটা তাই।

২.৩ বাড়িকে ইগলু বলে।

৩.নীচের বাক্যটিকে জটিল বাক্যে রূপান্তর করো :

একটা বরফের স্ল্যাবে দড়ি বাঁধা থাকে।

৪.নীচের বাক্যটিকে দুটি বাক্যে ভেঙে লেখো :

স্ল্যাবের বাইরের দিকে একটা দড়ি আছে সেটা টানলে দরজা খুলে যায়।

৫.নীচে দুটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে, কিন্তু প্রশ্নটি দেওয়া নেই। প্রশ্ন দুটি লেখো :

৫.১ ....?

উত্তর : ভেতরে ঢুকে দড়ি টেনে দিলে ঘরে আর কেউ ঢুকতে পারে না।

৫.২ ....?

উত্তর : ইগলুর ওপরের বরফে ভেন্টিলেশনের জন্য ফাঁকা রাখা হয়।

৬. নিম্নলিখিত শব্দগুলির যথাযথ বিপরীতার্থক শব্দ অনুচ্ছেদ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :

৬.১ উত্তর ৬.২ বাইরে ৬.৩ নেভে

৬.৪ ঝাপসা ৬.৫ ছাড়লে

৭.নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

৭.১ টোডাদের বাড়িতে কী দেখা যায়?

৭.২ এস্কিমোদের বিছানাটি কেমন হয়?

৭.৩ কখন গরম ও আরাম বোধ হয়?

উত্তর :

১.১ (গ) ১.২ (ক)

২.১ - জটিল ২.২ - যৌগিক ২.৩ - সরল

৩.একটা বরফের স্ল্যাবে যা বাঁধা থাকে, তা হলো দড়ি।

৪.স্ল্যাবের বাইরের দিকে একটি দড়ি আছে। এই দড়িটি ধরে টানলে দরজা খুলে যায়।

৫.১ কখন ঘরে আর কেউ ঢুকতে পারে না?

৫.২ ইগলুর ওপরের বরফে কেন ফাঁকা রাখা হয়?

৬.১ - দক্ষিণ ৬.২ - ভেতরে

৬.৩ - জ্বলে ৬.৪ - স্পষ্ট ৬.৫ - টানলে

৭.১ টোডাদের বাড়ির দরজা ইগলুর মতোই আকারে ছোটো, যাতে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়।

৭.২ এস্কিমোদের বিছানা সীল মাছের চামড়া দিয়ে তৈরি। এটি অনেকটা স্লিপিং ব্যাগের আদলে দুটি চামড়াকে পিঠোপিঠি সেলাই করে বানানো হয়।

৭.৩ বাইরের প্রবল শীতে সীল মাছের চামড়া দিয়ে তৈরি বিছানায় প্রথমে ঠান্ডা লাগলেও পরে গরম ও আরাম বোধ হয়।

হাতে কলমে

বোধপরীক্ষণ - এক

● **নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্ন-অনুসারে উত্তর দাও :**

পশ্চিম বাংলায় অজয় নামে একটা নদী আছে। তার উৎপত্তি হলো ছোটনাগপুরের মালভূমিতে। অজয় নামের মানেই হলো যাকে পোষ মানানো যায় না। কত যুগ ধরে কবিরা অজয় নদীর সর্বনাশা রূপ সম্বন্ধে কবিতা আর গান লিখেছেন। আজ পর্যন্ত মাঝে মাঝেই অজয় নদীর ধারের বালি খুঁড়ে কত লোকে পুরোনো নৌকোর অপূর্ব খোদাই করা ভাঙা টুকরো খুঁজে পায়। কাঠের নৌকোর টুকরো এখন পাথরের মতো হয়ে গেছে। দুই হাজার বছরের কী তার

বেশি পুরোনো ধাতু দিয়ে তৈরি দেবদেবীর মূর্তি আর বহুকাল আগে কোনো ভুলে-যাওয়া দুর্ঘটনায় যারা অজয় নদীর জলে প্রাণ দিয়েছিল। তাদের ব্যবহার করা কত গহনা, বাসনপত্র, এতদিন পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে।

১.নিম্নলিখিত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক চিহ্নিত করো :

১.১ অজয় নদীর যে রূপটি কবিদের গান ও কবিতায় ফুটে উঠেছে, তা হলো —

(ক) সৌন্দর্য (খ) ধ্বংসলীলা

(গ) বালিয়াড়ি (ঘ) নৌ-যাত্রা

১.২ অজয় নদীর তীরে এখনও পাওয়া যায়, বহু যুগের পুরোনো —

(ক) বাসন (খ) বালি

(গ) ধাতু (ঘ) সভ্যতা

১.৩ অজয় নদী বয়ে গেছে —

(ক) হুগলি জেলা দিয়ে (খ) বাঁকুড়া জেলা দিয়ে (গ) বীরভূম জেলা দিয়ে (ঘ) উত্তর ২৪ পরগনা দিয়ে

২.নিম্নলিখিত শব্দগুলির যথার্থ প্রতিশব্দ অনুচ্ছেদ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :

২.১ স্রোতস্বিনী ২.২ অভিনব

২.৩ প্রতিমা ২.৪ সৃষ্টি ২.৫ প্রাচীন

৩.'...... বহুকাল আগে কোনো ভুলে-যাওয়া দুর্ঘটনায় যারা অজয় নদীর জলে প্রাণ দিয়েছিল' — এই বাক্যটি থেকে সন্ধিবদ্ধ পদ খুজে বের করে, তার সন্ধিবিচ্ছেদ করো।

৪.অজয় নামের মানেই হলো যাকে পোষ মানানো যায় না। — এই বাক্যটিকে হ্যাঁ-বাচক বাক্যে লেখো।

৫.কত যুগ ধরে কবিরা অজয় নদীর সর্বনাশা রূপ সম্বন্ধে কবিতা আর গান লিখেছেন। (দুটি বাক্যে ভেঙে লেখো।)

৬.কাঠের নৌকোর টুকরো এখন পাথরের মতো হয়ে গেছে। — এই বাক্যটিকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তরিত করে লেখো।

৭.নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :

৭.১ অজয় নদীর উৎপত্তি কোথায়?

৭.২ অজয় নদীকে নিয়ে গান ও কবিতা রচিত হয়েছে কেন?

৭.৩ পশ্চিম বাংলায় অজয়ের মতোই সর্বনাশা বলে পরিচিত আর একটি নদীর নাম কী? এদের যে-কোনো একটি সম্পর্কে দু-তিনটি বাক্য লেখো।

৭.৪ ‘অজয় নদীর জলে প্রাণ দিয়েছিল’ — কারা প্রাণ দিয়েছিল? এর কারণ কী?

৭.৫ যে-কোনো নদী সম্পর্কে তোমার যা মনে হয় কয়েকটি বাক্যে লেখো।

বোধপরীক্ষণ - দুই

● **নীচের অনুচ্ছেদটি মনোযোগ দিয়ে পড়ে প্রশ্ন-অনুসারে উত্তর দাও :**

নদীর ধারে অনেকখানি বালি। তার ওপর দিয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে হাতির দল নদী পার হবার চেষ্টা করছিল। আগে যারা যাচ্ছিল, হঠাৎ সেই পুরুষ হাতির দলের মধ্যে একটা বিকট চ্যাঁচাতে লাগল। অমনি দলসুদ্ধ সকলে যে-যেখানে ছিল, কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

একটা হাতি নদীর ধারের বালিতে ডুবে যাচ্ছে। অন্য হাতিরা কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরেই পুরুষরা চটপট কাজে লেগে গেল। মা-হাতিরা বাচ্চাদের নিয়ে নদীর তীরে নিরাপদে উঁচু জমিতে, বাচ্চাদের মধ্যিখানে রেখে, বাইরের দিকে মুখ করে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাতিরা বড়ো বড়ো ডাল ভেঙে, সেগুলিকে দিয়ে চোরাবালির চারদিকে গোল করে ফেলতে লাগল। ক্রমে ডাল ফেলে তারা তাদের বিপদে-পড়া সঙ্গীর একেবারে কাছে পৌঁছে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই গাছের ডালের ওপর সামনের পায়ে ভর দিয়ে, আস্তে আস্তে সেই হাতিটা উঠে এল।

১.নীচের বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক চিহ্নিত করো :

১.১ দলসুদ্ধ যে-যেখানে ছিল কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল — কারণ

(ক) বনে আগুন লেগেছিল।

(খ) হাতিদের শিকারিরা তাড়া করেছিল।

(গ) একটা হাতি চোরাবালিতে ডুবে যাচ্ছিল।

(ঘ) হাতিরা একটা ফাঁদে পড়েছিল।

১.২ মা-হতিদের বাইরের দিকে মুখ করে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ার কারণ —

(ক) বিপদগ্রস্ত হাতিটি কীভাবে উদ্ধার পায়, ওরা তা দেখতে চেয়েছিল।

(খ) বাচ্চাদের আটকে রাখার জন্য এমন করতে হয়েছিল।

(গ) বাইরের দিকে খেয়াল রাখলে পালাতে সুবিধে হবে।

(ঘ) উপরের কোনোটিই নয়।

২. নদীর ধারে অনেকখানি বালি। তার ওপর দিয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে হাতির দল নদী পার হবার চেষ্টা করছিল। — এই বাক্য দুটি জুড়ে একটি বাক্যে পরিণত করো।

৩. অন্য হাতিরা কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। — 'হতভম্ব' - শব্দটি বদলে একই অর্থযুক্ত অন্য একটি শব্দ ব্যবহার করে বাক্যটি পুনরায় লেখো।

৪. নদীর ধারে অনেকখানি বালি। — 'খানি' কী ধরনের পদ।

৫.তারপরেই পুরুষরা চটপট কাজে লেগে গেল। — এই বাক্যটিকে নঞর্থক বা না-বাচক বাক্যে রূপান্তরিত করে লেখো।

৬.মা-হাতিরা বাচ্চাদের নিয়ে, নদীর তীরে নিরাপদে উঁচু জমিতে, বাচ্চাদের মধ্যিখানে রেখে, বাইরের দিকে মুখ করে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। — এই বাক্যটিকে ভেঙে তিনটি পৃথক বাক্যে লেখো।

৭.অমনি দলসুদ্ধ সকলেই যে-যেখানে ছিল, কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। — এই বাক্যটিকে সরল-বাক্যে রূপান্তরিত করো।

৮.নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :

৮.১ '..... হাতির দলের মধ্যে একটা বিকট চ্যাঁচাতে লাগল।' --- তার এই বিকট চিৎকারের কারণ কী ছিল?

৮.২ ‘তারপরেই পুরুষরা চটপট কাজে লেগে গেল।’ — পুরুষরা কী কাজে লাগল? তার ফলাফল কী হয়েছিল?

৮.৩ উপরের অনুচ্ছেদটির মধ্যে একটি নিটোল গল্পের আদল রয়েছে। এই গল্পটির কী নাম দেওয়া যায় লেখো? এই নামকরণের স্বপক্ষে দুটি যুক্তি দাও।

বোধপরীক্ষণ - তিন

● **নীচের অনুচ্ছেদটি মনোযোগ দিয়ে পড়ে প্রশ্ন-অনুসারে উত্তর দাও :**

খাড়া চড়াই। একটু একটু করে উঠছি। খানিকটা ওঠার পর দম ফুরিয়ে গেল। বুকটা এত ধড়ফড় করছে, মনে হচ্ছিল এই বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে

যায়। গলা শুকিয়ে কাঠ। .... প্রৌঢ় শেরপা পেম্বা নরবু। এতদিনে একটা কথাও তার মুখ থেকে কেউ শোনেনি। হঠাৎ সে মুখ খুলল। বলল, ‘শুনো সাব, বাঙালকা ইজ্জত বচানেকে লিয়ে হামলোগ জান দেনে কে লিয়ে তৈয়ার হ্যায়।’ সুকুমারের রক্ত উত্তাল হয়ে উঠল। বলল, ‘উপরে চলো।’ প্রায় আড়াইটে বাজে। এবার একটু জল খাবে সে। দিলীপ চট করে জলের বোতল খুলে গলায় উপুড় করে ঢেলে দিল। কিন্তু এ কী এক ফোঁটা জলও তার গলায় পড়ল না। অথচ বোতল জলে ভর্তি। দিলীপ দেখল বোতলের জল ঠান্ডায় জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। তবু দিলীপ বিরক্ত হলো না, অতি দুঃখে হেসে ফেলল।

১.নীচের বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক চিহ্নিত করো :

১.১ উপরের অনুচ্ছেদটির মূল বিষয় হলো —

(ক) ভ্রমণ (খ) পর্বতশৃঙ্গ অভিযান

(গ) বেড়ানো (ঘ) কোনোটিই নয়

১.২ 'বাঙালকা ইজ্জত বচানেকে লিয়ে হামলোগ জান দেনে কে লিয়ে তৈয়ার হ্যায়।' — এই বাক্যটির বাংলা তরজমা করলে দাঁড়ায় —

(ক) বাঙালির জন্য আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

(খ) বাঙালির কাজ করতে পেরে আমরা গর্বিত।

(গ) বাঙলার প্রাণ বাঁচাতে আমরা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত।

(ঘ) বাঙলার সম্মান বাঁচাতে আমরা প্রাণ দিতেও রাজি।

২.নিম্নলিখিত শব্দগুলির উপযুক্ত প্রতিশব্দ অনুচ্ছেদ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :

২.১ উঁচু বা খাড়া রাস্তা ২.২ চার-টুকরো হয়ে যাওয়া ২.৩ শ্বাসবায়ু ২.৪ আলোড়ন ২.৫ বিন্দু

৩.'দিলীপ চট করে জলের বোতল খুলে গলায় উপুড় করে ঢেলে দিল ।' — এই বাক্যটির উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ ভাগ করে দেখাও।

৪.'হঠাৎ সে মুখ খুলল।' — এই বাক্যটিকে না-বাচক বাক্যে রূপান্তরিত করে লেখো।

৫. সুকুমার বলল, ‘উপরে চলো।’ --- উক্তি পরিহার করে বাক্যটিকে অন্যভাবে লেখো।

৬. ‘দিলীপ দেখল বোতলের জল ঠান্ডায় জমে বরফ হয়ে গিয়েছে।’ — এই বাক্যটিকে জটিল বাক্যে রূপান্তরিত করো।

৭. ‘তবু দিলীপ বিরক্ত হলো না, অতি দুঃখে হেসে ফেলল।’ — এই বাক্যের বিশেষণ পদের নীচে দাগ দাও।

৮. নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :

৮.১ ‘সুকুমারের রক্ত উত্তাল হয়ে উঠল।’ — সুকুমারের রক্ত উত্তাল হয়ে উঠেছিল কেন?

৮.২ ‘অতি দুঃখে হেসে ফেলল।’ — কে হেসে ফেলল? এমন ঘটার কারণ কী বলে তোমার মনে হয়েছে?

৮.৩ ‘খাড়া চড়াই। একটু একটু করে উঠছি।’ — এমন একটি কাল্পনিক পর্বত অভিযানের অভিযাত্রী হিসেবে চার-পাঁচটি বাক্য লেখো।

বোধপরীক্ষণ - চার

● **নীচের অনুচ্ছেদটি মনোযোগ দিয়ে পড়ে প্রশ্ন অনুসারে উত্তর দাও :**

দক্ষিণ আমেরিকার পেরু রাজ্য। বিশাল আন্দিজ পর্বতমালার এক অংশ পড়েছে এই পেরুর মধ্যে। আন্দিজের এক সুউচ্চ মালভূমিতে লুকানো প্রাচীন ইনকা জাতির এক নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়েছিলাম আমরা। দুর্গম পথ, কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ। সরু ফিতের মতো রাস্তা বেয়ে আমাদের ছোটো ট্রেন ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে উঠেছে। মাঝখানে উরুবাম্বা নদীর গিরিখাত, তার ওপর লোহার ব্রিজ। ট্রেন থেকে নেমে পায়ে হেঁটে ব্রিজ পেরিয়ে ওপারে ট্যুরিস্ট বাসে উঠতে

হয়েছে। দূরে, যত দূরে চোখ যায় শুধু ঢেউয়ের মতো পর্বতমালা। আর সামনে পাহাড়ঘেরা মালভূমির ওপর এক আশ্চর্য নগরীর কঙ্কালদেহ। উঁচু চওড়া প্রাচীর, বিস্তৃত সোপান শ্রেণি, আর সারি সারি ছাদহীন কক্ষ সব পাথরে তৈরি। এই নির্জন মৃত প্রস্তরপুরী হচ্ছে ইনকাদের হারানো শহর ভিলকাপাম্পা যার আধুনিক নাম মাচুপিচু।

১.নীচের বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক চিহ্নিত করো :

১.১ ইনকা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখতে দুর্গম পাহাড়ি পথে যে নদীর গিরিখাত পেরোতে হয়, তার নাম —

(ক) উরুবাম্বা (খ) আন্দিজ

(গ) পেরু (ঘ) রকি

১.২ ছোটো ট্রেন থেকে নেমে লোহার ব্রিজ পেরোতে হয় —

(ক) বাসে চেপে (খ) সাইকেলে চেপে

(গ) পায়ে হেঁটে (ঘ) এক লাফে

২.এই নির্জন মৃত প্রস্তরপুরী হচ্ছে ইনকাদের হারানো শহর — নিম্নরেখ পদটির সন্ধিবিচ্ছেদ করো।

৩.‘দুর্গম পথ, কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ ।’ --- এই বাক্যটি সরলবাক্যে রূপান্তরিত করো।

৪.নীচের শব্দগুলির যথার্থ প্রতিশব্দ অনুচ্ছেদ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :

৪.১ সিঁড়ি ৪.২ মনোরম ৪.৩ ঘর

৪.৪ তরঙ্গায়িত

৫.<u>দুর্গম</u> পথ — নিম্নরেখ পদটি কীভাবে গঠিত হয়েছে দেখাও।

৬.দক্ষিণ আমেরিকার পেরু রাজ্য। বিশাল আন্দিজ পর্বতমালার এক অংশ পড়েছে এই পেরুর মধ্যে। (একটি বাক্যে পরিণত করো।)

৭.সরু ফিতের মতো রাস্তা বেয়ে আমাদের ছোটো ট্রেন ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে উঠেছে। (দুটি বাক্যে ভেঙে লেখো।)

৮.দূরে, যত দূরে চোখ যায় <u>শুধু</u> ঢেউয়ের মতো পর্বতমালা। — নিম্নরেখপদটি কী ধরনের পদ?

৯.আশ্চর্য সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ। — 'সুন্দর' এবং 'প্রাকৃতিক' পদদুটির যথাক্রমে বিশেষণ এবং বিশেষ্যের রূপ দুটি লেখো।

১০. ‘এই নির্জন মৃত প্রস্তরপুরী হচ্ছে ইনকাদের হারানো শহর .....’ --- এই বাক্যের ‘প্রস্তরপুরী’-র মতো — ‘পুরী’ সহযোগে আরও দুটি শব্দ বানাও।

১১. নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :

১১.১ মাচুপিচু কী?

১১.২ ‘এক আশ্চর্য নগরীর কঙ্কালদেহ’ — এই নগরীটি কোথায় অবস্থিত? এর যাত্রাপথের বিবরণ দাও।

১১.৩ প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ হয়তো আমরা সবাই দেখিনি। কিন্তু আমাদের চারপাশে এমন অনেক প্রাচীন বাড়ি-মন্দির-মসজিদ-গির্জা-স্তূপ ছড়িয়ে

ছিটিয়ে আছে। এই ধরনের তোমার দেখা যে-কোনো একটি পুরোনো স্থাপত্যকীর্তির কথা চার-পাঁচটি বাক্যে লেখো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দিনলিপি

তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে চতুর্থ শ্রেণির 'ভাষাপাঠ' বইটির কথা। সেখানে বেশ বিস্তারিতভাবেই 'দিনলিপি' কীভাবে লিখতে হয়, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। স্পষ্ট মনে করতে যদি খুব অসুবিধা হয়, তাহলে আরেকবার দু-একটি প্রসঙ্গ ধরিয়ে দিই। কেতাবি ভাষায় যাকে বলে, 'পুনরালোচনা'।

'দিনলিপি' লেখা মানে সাল-তারিখ উল্লেখ করে, প্রতিদিনের ঘটনাবলি পরম্পরা মেনে লিখে ফেলা। যদি নিষ্ঠার সঙ্গে 'দিনলিপি' লিখতে হয়

তাহলে দিনের শেষে একটা নির্দিষ্ট সময় স্থির করে নেওয়াই ভালো। কেননা, একদিন দুদিন তিনদিন পরে লিখতে বসলে দেখবে অনেক ঘটনাই আবছা হয়ে গেছে কিংবা ওলটপালট হয়ে গেছে। 'দিনলিপি' শব্দটার মধ্যেও একটা নিয়মিত লেখার ইশারা রয়েছে। অন্যদিকে, 'দিনলিপি' লেখার অভ্যাস ভাষার ওপর দখল তৈরি করে, নিজের অভিজ্ঞতাকে স্পষ্ট, অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে লিখে ফেলতে সাহস জোগায় আর সবথেকে বড়ো কথা তোমার জীবনের একটা ইতিহাস 'দিনলিপি'-তে ধরা থাকে। অনেক বছর পরে বড়ো হয়ে যদি আজকের 'দিনলিপি' পড়ো তাহলে একথার মর্ম উপলব্ধি করতে পারবে।

'দিনলিপি' লেখার জন্য সবথেকে সুবিধেজনক হলো 'ডায়রি' জোগাড় করা। ডায়রি-তে দেখবে প্রত্যেক দিন এবং সালের উল্লেখ প্রথমেই দেওয়া

থাকে। খাতায় 'দিনলিপি' লিখলেও অসুবিধে নেই। শুধু, দেখতে হবে, তাতে ৩৬৫ দিনের আলাদা আলাদা পাতা যেন থাকে। ওপরে সাল-তারিখ নিজেই লিখে নেবে।

'দিনলিপি' লিখতে হবে রোজ। অনেকে ভাবেন, তেমন কোনো মনে রাখার মতো ঘটনা ঘটলে তবেই লেখার প্রয়োজন। এ ভাবনা কিন্তু সমর্থনযোগ্য নয়। ছোটো হলেও প্রতিদিন লিখতে হয় দিনলিপি, যাতে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। সারা দিনে অনেক অভিজ্ঞতাই হয় আমাদের। সাধারণ, তুচ্ছ বলে উপেক্ষা করার কোনো কারণ নেই। ঘটনার ঘনঘটা নেই এমন একটা দিনের গুরুত্বও জীবনে কম নয়।

'দিনলিপি' লেখার সময় কোনো কথাই বানিয়ে লিখো না। এমনকী, যদি নিজস্ব কোনো একান্ত অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা সংগোপনে উপভোগ

করো তাহলে সেকথাও ‘দিনলিপি’তে অকপটে লিখে রাখো। ‘দিনলিপি’ তো সবই সবার পড়ার জন্য নয়। বলা চলে, ‘দিনলিপি’ হলো আসলে তোমার নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলার একটা পরিসর। ওখানে কোনো আড়াল বা গোপনীয়তা না রাখাই ভালো।

‘দিনলিপি’ থেকে, পরে অনেক কথাই জানা যেতে পারে। বিভিন্ন সালের বিশেষ বিশেষ দিন তুমি কেমনভাবে কাটিয়েছিলে, কী কী ভেবেছিলে, কোন-কোন শপথ করেছিলে সবই ‘দিনলিপি’-তে ধরা থাকে। হতে পারে, সেই বিশেষ দিন তোমার জন্মদিন অথবা পঁচিশে বৈশাখ, বা পনেরোই আগস্ট বা ছাব্বিশে জানুয়ারি। এছাড়া, অন্যান্য সামাজিক বা ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠান তো আছেই। ধরো দুর্গাপুজো বা খুশির ইদ বা বুদ্ধ-জয়ন্তী বা গুড ফ্রাইডে। এইসব

দিন কীভাবে তুমি কাটালে তার নিখুঁত খুঁটিনাটি লেখা থাকে 'দিনলিপি'-তে।

'দিনলিপি'-র একটা অন্য মজাও রয়েছে। মিলিয়ে দেখতে পারো। কোনো একজন মানুষের 'দিনলিপি' অন্য একজনের থেকে অনেকটাই আলাদা। ফলে, কারোর দিনলিপি দেখে হুবহু লেখা চলে না।

অনেক বিখ্যাত মানুষই, বিশেষত যাঁরা লেখক বা সাহিত্যিক, তাঁরা 'দিনলিপি' লিখেছেন। যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের লেখা 'দিনলিপি' পড়লে এ বিষয়ে একটা ধারণা তৈরি হতে পারে। কখনো কখনো, ঘটনাবহুল কোনো দিনে মনে হতে পারে 'দিনলিপি' লেখার জন্য খাতা বা ডায়রির একটা পাতাই যথেষ্ট নয়। নামী বরেণ্য লেখকদের

'দিনলিপি' থেকে এই সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কথা লেখার রীতিটি শিখে নিতে পারো।

'দিনলিপি' নিয়মিত লিখতে লিখতে বুঝতে পারবে, এটা বেশ একটা আনন্দদায়ক অনুশীলন। তাহলে আর দেরি কেন? বছরের গোড়া থেকেই এই উপভোগ্য অভ্যাসটা করে ফেলো। কীভাবে 'দিনলিপি' লিখতে হয় তার একটা ধারণা যাতে তোমরা করতে পারো সেজন্য কয়েকটি নমুনা এখানে দেওয়া হলো।

'দিনলিপি' লেখার সময় কয়েকটি কথা কিছুতেই ভুলবে না। 'দিনলিপি' তে সাল এবং তারিখ লেখার ওপরে উল্লেখ করতে হবে। সহজ-সরল ভাষায় তোমরা নিজের অভিজ্ঞতার খুঁটিনাটি যেন লেখাটির মধ্যে থাকে। কোনো অবস্থাতেই অন্যের লেখা বইয়ের লেখা মুখস্থ করে তোমরা 'দিনলিপি' লিখবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২ আগস্ট ১৮৯০। তখন সূর্য অস্তপ্রায়। জাহাজের ছাদের উপর হালের কাছে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের তীরের দিকে চেয়ে রইলুম। সমুদ্রের জল সবুজ, তীরের রেখা নীলাভ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সন্ধ্যা রাত্রির দিকে এবং জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে ক্রমশই অগ্রসর হচ্ছে। বামে বোম্বাই বন্দরের এক দীর্ঘরেখা এখনো দেখা যাচ্ছে ; দেখে মনে হলো আমাদের পিতৃপিতামহের পুরাতন জননী সমুদ্রের বহুদূর পর্যন্ত ব্যাকুল বাহু বিক্ষেপ করে ডাকছেন ; বলছেন, 'আসন্ন রাত্রিকালে অকূল সমুদ্রে অনিশ্চিতের উদ্দেশে যাস নে; এখনো ফিরে আয়।'

ক্রমে বন্দর ছাড়িয়ে গেলুম। সন্ধ্যার মেঘাবৃত অন্ধকারটি সমুদ্রের অনন্তশয্যায় দেহ বিস্তার

করলে। আকাশে তারা নেই। কেবল দূরে লাইট-হাউসের আলো জ্বলে উঠল ; সমুদ্রের শিয়রের কাছে সেই কম্পিত দীপশিখা যেন ভাসমান সন্তানদের জন্যে ভূমিমাতার আশঙ্কাকুল জাগ্রত দৃষ্টি।

২৬ আগস্ট। শনিবার থেকে আর আজ এই মঙ্গলবার পর্যন্ত কেটে গেল। জগতে ঘটনা বড়ো কম হয়নি—সূর্য চারবার উঠেছে এবং তিনবার অস্ত গেছে ; বৃহৎ পৃথিবীর অসংখ্য জীব দন্তধাবন থেকে দেশ-উদ্ধার পর্যন্ত বিচিত্র কর্তব্যের মধ্যে দিয়ে তিনটে দিন মহা ব্যস্তভাবে অতিবাহিত করেছে---জীবনসংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্বাচন, আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা প্রভৃতি জীবরাজ্যের বড়ো বড়ো ব্যাপার সবেগে চলছিল—কেবল আমি শয্যাগত জীবন্মৃত হয়ে পড়ে ছিলুম। আধুনিক

কবিরা কখনো মুহূর্তকে অনন্ত কখনো অনন্তকে মুহূর্ত আখ্যা দিয়ে প্রচলিত ভাষাকে নানা প্রকার বিপরীত ব্যায়াম বিপাকে প্রবৃত্ত করান। আমি আমার এই চারটে দিনকে বড়ো রকমের একটা মুহূর্ত বলব, না এর প্রত্যেক মুহূর্তকে একটা যুগ বলব, স্থির করতে পারছি নে।

২৯ আগস্ট। জ্যোৎস্না রাত্রি। এডেন বন্দরে এসে জাহাজ থামল। আহারের পর রহস্যালাপে প্রবৃত্ত হবার জন্যে আমরা দুই বন্ধু ছাদের এক প্রান্তে চৌকিদুটি সংলগ্ন করে আরামে বসে আছি। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র এবং জ্যোৎস্নাবিমুগ্ধ পর্বতবেষ্টিত তটচিত্র আমাদের আলস্যবিজড়িত অর্ধনিমীলিত নেত্রে স্বপ্নমরীচিকার মতো লাগছে।

('য়ুরোপযাত্রী' থেকে গৃহীত)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ সকালে মাহেন্দু ঘাট থেকে স্টিমারে হরিহরছত্র মেলা দেখতে গিয়ে কত কী দেখলাম। ভেটারিনারি হাসপাতালে জিনিসপত্র রেখে টমটমে বেরুলাম। কী ভিড়, ধুলো। সেই যে মেয়েটি ধূলায় ধূসরিত কেশ নিয়ে বসে আছে, ভারী সুন্দর দেখতে। হাতি বাজার, উট বাজার, চিড়িয়া বাজার—কত সাহেব-মেম ধূলি-ধূসরিত হয়ে মেলা দেখে বেড়াচ্ছে। হাজিপুর থেকে, মজফ্‌ফরপুর থেকে ট্রেন সব আসছে, লোক ঝুলতে ঝুলতে আসছে বাইরে। একটা ঘোড়া কেমন নাচতে নাচতে এল। টমটমওয়ালারা চিৎকার করছে—'ধাক্কা বাঁচাও।' একটি মেয়ে কাঁদছে, তার স্বামী কোথায় গিয়েছে—পাত্তা

পাচ্ছে না। সাবন জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের তাঁবু পড়েছে।

সন্ধ্যা ৭টা, ৭ই নভেম্বর, ১৯২৭, রেলওয়ে কম্পার্টমেন্ট,সোনপুর

(‘স্মৃতির রেখা’ থেকে গৃহীত)

নমুনা — এক

২৬ জানুয়ারি, ২০১৪

২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস। সেজন্য আজ বিদ্যালয় ছুটি ছিল। তবে, ভোরবেলা আমরা বিদ্যালয়ে সবাই উপস্থিত হলাম। আমাদের শ্রেণি-শিক্ষক প্রদীপ্তবাবু আগেই বলে দিয়েছিলেন সকাল সাতটার মধ্যে স্কুলে পৌঁছোতে। গিয়ে দেখলাম সারা স্কুল জমজমাট। স্কুলের প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্ররা জমা হয়েছে। আমরা বন্ধুরা সুজয়, মৈনাক, রবিউল, বিভা সকলেই এসেছে।

ঠিক সাতটায় প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠান শুরু হলো। আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনন্তবাবু আর সহ-প্রধান শিক্ষক নৃপেন্দ্রবাবু জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী' গানটি অনুষ্ঠানের শুরুতে পরিবেশন করল। তারপর ইতিহাসের মাস্টারমশাই সমীরণবাবু 'প্রজাতন্ত্র দিবস' উদ্‌যাপন করার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য আমাদের সামনে ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর কথা শুনেই জানতে পারলাম ২৬ জানুয়ারি তারিখেই ভারতের সংবিধান ১৯৫০ সালে গৃহীত হয়েছিল। আমাদের দেশের অস্তিত্ব এই সংবিধানের মাধ্যমেই সুদৃঢ় আকার গ্রহণ করে। প্রধান শিক্ষক অনন্তবাবু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরযোদ্ধাদের কাহিনি শোনালেন। আমরা

সকলেই সেই গল্প শুনে স্বদেশের জন্য, দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের জন্য গর্বিত হয়ে উঠলাম। প্রণাম জানালাম তাঁদের। শেষে দশম শ্রেণির ছাত্ররা শোনাল রবীন্দ্রনাথের লেখা গান 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'। কাজী নজরুল ইসলামের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাল ষষ্ঠ শ্রেণির জয়ন্ত মুর্মু। শেষে আমরা সকলে মিলে ভারতের জাতীয় সংগীত 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' গাইলাম। বাড়ি ফিরতে ফিরতে দেখলাম পাড়ার বেশ কয়েকটি বাড়ির ছাদে উড়ছে ভারতের জাতীয় পতাকা।

নমুনা — দুই

১৭ ডিসেম্বর,২০১৪

আজ আমাদের বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। দারুণ আনন্দ আর

উত্তেজনার মধ্যে দিনটি কাটালাম। দুটি পুরস্কার আমি পেয়েছি। ২০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় আর লঙ-জাম্পে তৃতীয় পুরস্কার। দুটি ইভেন্টেই ষষ্ঠ এবং সপ্তম উভয় ক্লাসের ছাত্রীরা ছিল। ফলে, খুব কঠিন ছিল প্রথম তিনের মধ্যে আসা। খুবই উপভোগ করেছি ছাত্রীদের 'যেমন খুশি সাজো' আর আমাদের দিদিমণিদের 'মিউজিক্যাল চেয়ার কম্পিটিশন'। 'যেমন খুশি সাজো'-তে ক্লাস টেনের মধুমিতাদি বহুরূপী সেজে প্রথম পুরস্কার পেল। আমার কিন্তু সবথেকে ভালো লেগেছে ক্লাস এইট-এর শম্পাদির 'বাউল' সেজে গান গাওয়া। ও যদিও দ্বিতীয় পুরস্কার পেল।

আমাদের ক্লাসের রাবেয়া ফেরিওয়ালা সেজেছিল। ওকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হলো।

মিউজিক্যাল চেয়ারে প্রথম পুরস্কার পেলেন অঙ্কের রাজিয়াদি। প্রধানশিক্ষিকা রূপাদি একটুর জন্য প্রথম হতে পারলেন না। চেয়ারে বসার জন্য শিক্ষিকাদের দৌড়াদৌড়ি আর প্রাণপণ বসার চেষ্টা আমরা খুব উপভোগ করেছি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামী। প্রসিদ্ধ সাঁতারু মাসুদুর রহমান ছিলেন বিশেষ অতিথি। তাঁদের বক্তব্য শুনে আমরা সবাই অত্যন্ত আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছি। আমার প্রাইজের কাপ দুটি সযত্নে আলমারিতে রেখে দিয়েছি।

হা
তে
ক
ল
মে

● **নীচের দিনগুলিকে তুমি কীভাবে কাটিয়েছ, 'দিনলিপি'-র আকারে লেখো:**

১.তোমার জন্মদিন

২.সরস্বতী পূজা

৩.সবেবরাত

৪.যিশু খ্রিস্টের জন্মদিবস

৫.বুদ্ধজয়ন্তী

৬.মহাবীর জয়ন্তী

৭.উল্লেখযোগ্য ঘটনাবিহীন একটি দিন

৮.বাংলা নববর্ষ

৯.একটি বনভোজনের দিন

১০. স্কুলের একটি স্মরণীয় ঘটনার দিন

আমার পাতা

আমার পাতা